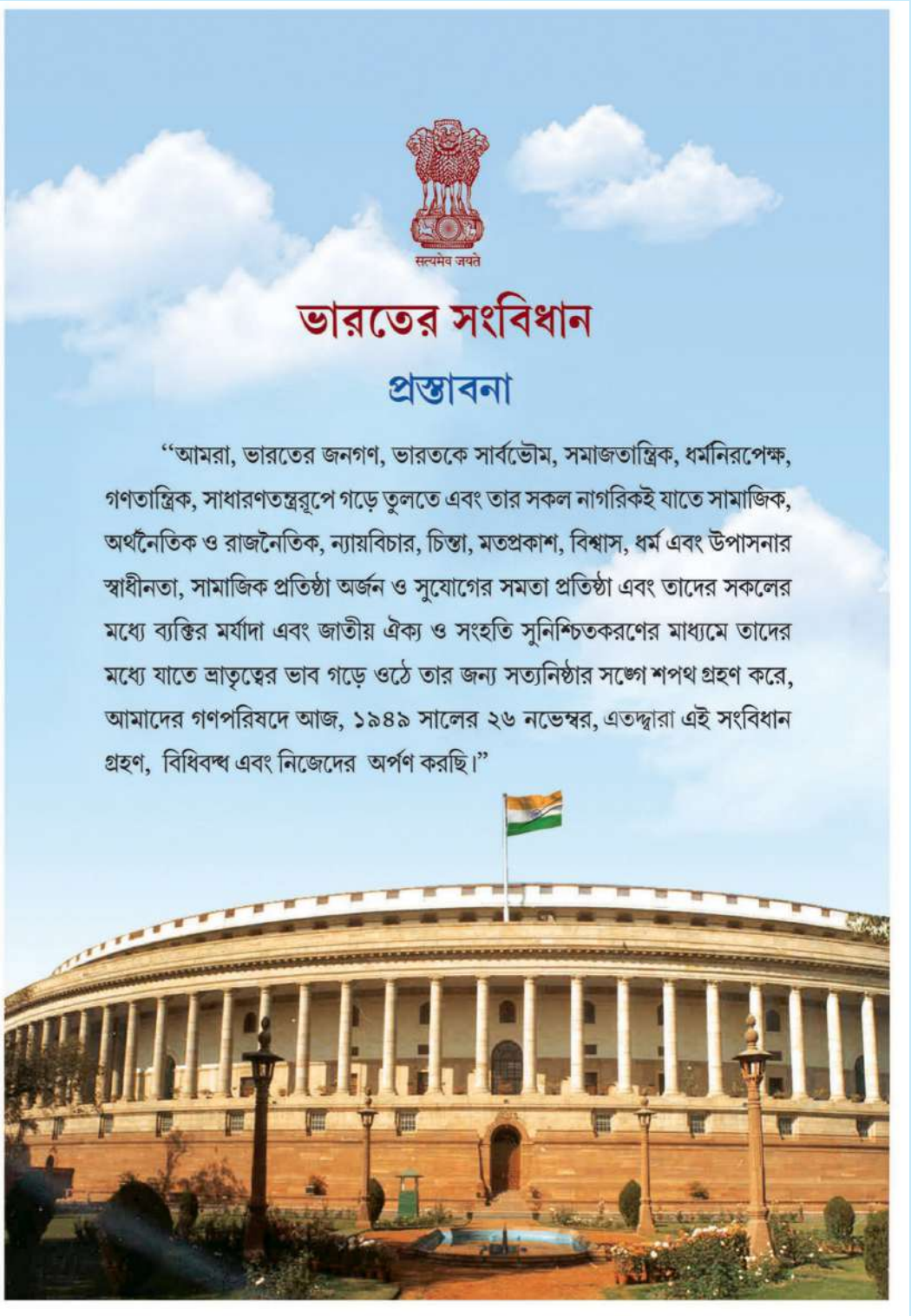
सत्यमेव जयते
ভারতের সংবিধান
প্রস্তাবনা
"আমরা, ভারতের জনগণ, ভারতকে সার্বভৌম, সমাজতান্ত্রিক, ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক, সাধারণতন্ত্ররূপে গড়ে তুলতে এবং তার সকল নাগরিকই যাতে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক, ন্যায়বিচার, চিন্তা, মতপ্রকাশ, বিশ্বাস, ধর্ম এবং উপাসনার স্বাধীনতা, সামাজিক প্রতিষ্ঠা অর্জন ও সুযোগের সমতা প্রতিষ্ঠা এবং তাদের সকলের মধ্যে ব্যক্তির মর্যাদা এবং জাতীয় ঐক্য ও সংহতি সুনিশ্চিতকরণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে যাতে ভ্রাতৃত্বের ভাব গড়ে ওঠে তার জন্য সত্যনিষ্ঠার সঙ্গে শপথ গ্রহণ করে, আমাদের গণপরিষদে আজ, ১৯৪৯ সালের ২৬ নভেম্বর, এতদ্দ্বারা এই সংবিধান গ্রহণ, বিধিবদ্ধ এবং নিজেদের অর্পণ করছি।"

Constitution of India

Part IV A (Article 51 A)

Fundamental Duties

It shall be the duty of every citizen of India —

(a) to abide by the Constitution and respect its ideals and institutions, the National Flag and the National Anthem;

(b) to cherish and follow the noble ideals which inspired our national struggle for freedom;

(c) to uphold and protect the sovereignty, unity and integrity of India;

(d) to defend the country and render national service when called upon to do so;

(e) to promote harmony and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India transcending religious, linguistic and regional or sectional diversities; to renounce practices derogatory to the dignity of women;

(f) to value and preserve the rich heritage of our composite culture;

(g) to protect and improve the natural environment including forests, lakes, rivers, wildlife and to have compassion for living creatures;

(h) to develop the scientific temper, humanism and the spirit of inquiry and reform;

(i) to safeguard public property and to abjure violence;

(j) to strive towards excellence in all spheres of individual and collective activity so that the nation constantly rises to higher levels of endeavour and achievement;

*(k) who is a parent or guardian, to provide opportunities for education to his child or, as the case may be, ward between the age of six and fourteen years.

Note: The Article 51A containing Fundamental Duties was inserted by the Constitution (42nd Amendment) Act, 1976 (with effect from 3 January 1977).

*(k) was inserted by the Constitution (86th Amendment) Act, 2002 (with effect from 1 April 2010).

অর্থনীতি

নবম শ্রেণির পাঠ্যবই

প্রস্তুতকরণ

জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, নতুন দিল্লি।

অনুবাদ ও অভিযোজন

রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ, ত্রিপুরা ।

© এন সি ই আর টি কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

অর্থনীতি

নবম শ্রেণির পাঠ্যবই

(এন সি ই আর টি-র অর্থনীতি
পাঠ্যবইয়ের ২০১৭ সালের অনূদিত সংস্করণ)

এন সি ই আর টি
অনুমোদিত
প্রথম বাংলা সংস্করণ

প্রথম প্রকাশ :
ডিসেম্বর, ২০১৮
পুনর্মুদ্রণ :
মার্চ., ২০২০

প্রকাশক : রাজ্য শিক্ষা গবেষণা
ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ
ত্রিপুরা

প্রচ্ছদ ও অক্ষর বিন্যাস
লক্ষ্মণ দেবনাথ

মূল্য : ৫০.০০ টাকা

মুদ্রণ : সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড,
১৩ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২

ভূমিকা

২০০৬ সাল থেকে রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত প্রাথমিক ও উচ্চপ্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তকের মুদ্রণ ও প্রকাশের দায়িত্ব পালন করে আসছে।

রাজ্যের বিদ্যালয়স্তরে উন্নত ও সমৃদ্ধতর পাঠ্যক্রম চালু করার লক্ষ্যে ত্রিপুরা রাজ্য শিক্ষা দপ্তরের প্রচেষ্টায় প্রথম থেকে অষ্টম, নবম ও একাদশ শ্রেণির জন্য ২০১৯ শিক্ষাবর্ষ থেকে জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের (এন সি ই আর টি) পাঠ্যপুস্তকসমূহ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০১৯ সালে প্রথম প্রকাশ করা হয় এবং এ বছর ওইসব পুস্তকগুলোর পুনর্মুদ্রণ করা হল। পাশাপাশি দশম ও দ্বাদশ শ্রেণির বাংলা বিষয় ছাড়া অন্যান্য বিষয়গুলোর জন্য জাতীয় শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদের প্রকাশিত পুস্তকগুলোর অনূদিত ও অভিযোজিত সংস্করণ ২০২০ শিক্ষাবর্ষে প্রথম প্রকাশ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলা বিষয়ে পাঠ্যপুস্তক প্রকাশনার দায়িত্বও রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ পালন করে আসছে।

বিশাল এই কর্মকাণ্ডে যেসব শিক্ষক-শিক্ষিকা, অধ্যাপক-অধ্যাপিকা, শিক্ষাবিদ, অনুবাদক, অনুলেখক, মুদ্রণকর্মী ও শিল্পীরা আমাদের সঙ্গে থেকে নিরলসভাবে অক্লান্ত পরিশ্রমে এই উদ্যোগ বাস্তবায়িত করেছেন তাদের সবাইকে সকৃতজ্ঞ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রকাশিত এই পাঠ্যপুস্তকটির উৎকর্ষ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য শিক্ষানুরাগী ও গুণীজনের মতামত ও পরামর্শ বিবেচিত হবে। মার্চ

উত্তম কুমার চাকমা
অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা গবেষণা ও প্রশিক্ষণ পর্ষদ
ত্রিপুরা।

আগরতলা
মার্চ, ২০২০

উপদেষ্টা

ড. অর্ণব সেন, সহঅধ্যাপক, এন ই আর আই ই, শিলং

ড. অরূপ কুমার সাহা, সহঅধ্যাপক, আর আই ই, ভুবনেশ্বর

পাঠ্যপুস্তকটি অনুবাদে যাঁরা সহায়তা করেছেন :

শ্রী চন্দন দেবনাথ, শিক্ষক

শ্রী শুভাশিস পাল, শিক্ষক

শ্রী জয়শ্রী সোম, শিক্ষিকা

শ্রী সুরজিৎ দেবনাথ, শিক্ষক

শ্রী দেবমাল্য ভট্টাচার্য, শিক্ষক

শ্রী জীবন চন্দ্র দে, শিক্ষক

শ্রী গৌতম রায় বর্মণ, শিক্ষক

শ্রী বিশ্বনাথ রায়, শিক্ষক

পরিমার্জনায়

শ্রী প্রবুদ্ধসুন্দর কর, শিক্ষক

শ্রী আশিস দেবনাথ, শিক্ষক

প্রাক্‌কথন

রাষ্ট্রীয় পাঠ্যক্রম রূপরেখা, ২০০৫ সুপারিশ করেছে শিশুদের বিদ্যালয় জীবনের সাথে তাদের বিদ্যালয়ের বাইরের জীবনের সমন্বয় ঘটাতে হবে। এই নীতি স্পষ্টভাবেই মুখস্থ বিদ্যার পরিপন্থী যা এতকালে আমাদের শিক্ষাব্যবস্থাকে প্রভাবিত করেছে এবং বিদ্যালয়, বাড়ি এবং সমাজের মধ্যে ব্যবধান সৃষ্টি করেছে। NCF - এর সুপারিশ অনুসারে যে পাঠ্যক্রম ও পাঠ্যবইয়ের উন্নয়ন করা হয়েছে তা এই প্রাথমিক ধারণাকে কেন্দ্র করে। মুখস্থ করে জ্ঞান অর্জন এবং বিভিন্ন বিষয়ের জ্ঞান আহরণে অহেতুক সীমারেখা তৈরি করাকে প্রতিহত করবে। আমরা আশা করছি জাতীয় শিক্ষানীতি ১৯৮৬ তে যে শিশুকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থার রূপরেখা তুলে ধরা হয়েছিল নতুন পাঠ্যপুস্তকের মাধ্যমে তার সফল রূপায়ণ সম্ভবপর হবে।

এই প্রচেষ্টার সাফল্য নির্ভর করবে বিদ্যালয় প্রধান ও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের প্রয়োগ করা শিক্ষণ পদ্ধতির ওপর যেখানে শিশুরা নিজের মতো করে চিন্তা করার এবং নিজের কৌশল প্রয়োগ করার সুযোগ পাবে। শিশুদের উৎসাহিত করতে হবে যাতে ওরা উদ্ভাবনী ও কল্পনাশক্তি দিয়ে হাতেকলমে কাজকর্মের মাধ্যমে পাঠের উপযোগী প্রশ্ন তৈরি করতে পারে। আমরা শিশুদের সময়, সুযোগ ও স্বাধীনতা দেব যাতে তারা বড়োদের কাছ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানকে মাধ্যম করে নতুন নতুন জ্ঞান আহরণ করতে পারে। নির্বাচিত পাঠ্যপুস্তককেই শিশুদের জ্ঞানের মূল্যায়নের একমাত্র ভিত্তি হিসাবে মেনে নেওয়ার কারণেই জ্ঞান আহরণের অন্যান্য উপাদান ও পদ্ধতি অবহেলিত হয়েছে। শিশুদের মধ্যে সৃজনশীলতা ও উদ্যম সৃষ্টি করা সম্ভব হবে যদি আমরা ওদের শুধুমাত্র নির্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তকে সীমাবদ্ধ জ্ঞানের আহরণকারী হিসাবে চিন্তা না করে শিক্ষা প্রক্রিয়ার অংশগ্রহণকারী হিসাবে বিবেচনা করি।

এই উদ্দেশ্যগুলি বিদ্যালয়স্তরে শিক্ষা প্রক্রিয়ায় বিশেষ ধরনের পরিবর্তন আনবে। আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মের সময় তালিকায় যেমন নমনীয়তা প্রয়োজন আছে, তেমনি বিদ্যালয়গুলিতে কঠোর নিয়মানুবর্তিতা মেনে চলতে হবে যাতে বিদ্যালয়গুলি বার্ষিক সময়সূচি অনুসারে শিক্ষক শিক্ষিকাদের নির্দিষ্ট পাঠ্যক্রম শ্রেণিকক্ষে নির্দিষ্ট সময়ে প্রদান করতে পারেন। শিক্ষকরা যে শিক্ষণ পদ্ধতিতে শিশুদের শিক্ষা দেবেন ও তার মূল্যায়ন করবেন তার উপর নির্ভর করবে এই

পাঠ্যবই কীভাবে শিশুদের বিদ্যালয় জীবনে সুখের অভিজ্ঞতা এনে দেবে, ওরা মুক্তি পাবে উদ্বেগ ও একঘেয়ে বিরক্তিকর অভিজ্ঞতার হাত থেকে। পাঠ্যক্রম প্রণেতারা চেষ্টা করেছেন কীভাবে শিশুদের ওপর থেকে পাঠ্যপুস্তকের বোঝা কমানো যায়। তাই তাঁরা শিশুর মনস্তত্ব ও শ্রেণিকক্ষে পাঠদানের সময়ের দিকে লক্ষ রেখে পাঠ্যক্রমের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করেছেন। এই উদ্যোগকে সফল করার লক্ষ্যে শিশুরা যাতে ছোটো ছোটো দল গঠন করে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে ও হাতেকলমে শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান অর্জন করতে পারে, পাঠ্যপুস্তকে তার দিক নির্দেশ করা হয়েছে।

এই পাঠ্যপুস্তকটি রচনার ক্ষেত্রে পাঠ্যপুস্তক উন্নয়ন কমিটির সদস্যগণ যে কঠোর পরিশ্রম করেছেন তার জন্য এন সি ই আর টি তাঁদের কাজের প্রশংসা করছে। আমরা ধন্যবাদ জানাচ্ছি সমাজ বিজ্ঞান উপদেষ্টা কমিটির চেয়ারপার্সন অধ্যাপক হরি বাসুদেবন এবং প্রধান উপদেষ্টা অধ্যাপক তাপস মজুমদারকে তাঁদের সুচিন্তিত পরামর্শের জন্যে। কতিপয় শিক্ষক এই পাঠ্যবইটির উন্নতিকল্পে অবদান রেখেছেন। এই প্রচেষ্টাকে সম্ভব করে তোলার জন্য ওই সকল বিদ্যালয়ের প্রধানশিক্ষকদের কৃতজ্ঞতা জানাই। আমরা ঋণী ওই সমস্ত প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি যাঁরা বিভিন্ন সহায়সম্পদ ও তাঁদের কর্মীদের দিয়ে আমাদেরকে সাহায্য করেছেন। আমরা কৃতজ্ঞ জাতীয় তত্ত্বাবধায়ক কমিটির সদস্যদের প্রতি তাঁদের মূল্যবান সময় ও অবদানের জন্য, বিশেষভাবে যাঁরা মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রকের আওতাধীন মাধ্যমিক ও উচ্চতর মাধ্যমিক শিক্ষার চেয়ারপার্সন অধ্যাপক মৃণাল মিরি ও অধ্যাপক জি পি দেশপান্ডে কর্তৃক নিয়োগকৃত। ক্রম সংস্কার ও নিরবচ্ছিন্ন উন্নতির জন্য সর্বদা এই সংস্থা দায়বদ্ধ। এন সি ই আর টি এই বইটির আরও পরিমার্জন ও উন্নতিকল্পে আপনাদের মন্তব্য ও পরামর্শকে সবর্দা স্বাগত জানায়।

অধিকর্তা
রাষ্ট্রীয় শিক্ষা গবেষণা ও
প্রশিক্ষণ পর্ষদ

নতুন দিল্লি
২০ ডিসেম্বর, ২০০৫

Textbook Development Committee

Chairperson, Advisory Committee for Textbooks in Social Sciences

Hari Vasudevan, *Professor,* Department of History, University of Culculta, Kolkata

Chief Advisor

Tapas Majumdar, *Professor Emeritus of Economics,* Jawaharlal Nehru University, New Delhi.

Team Members

Gulsan Sachdeva, *Associate Professor,* School of International Studies, Jawaharlal Nehru University, New Delhi

Nutan Punj, *PGT,* Kendriya Vidhyalaya, Border Security Force, Najafgarh, New Delhi

Sukanya Bose, *Senior Economist,* Economic Research Foundation, Katwaria Sarai, New Delhi

Member-Coordinator

Jaya Singh, *Associate Professor,* DESS, NCERT, New Delhi

কৃতজ্ঞতা

নবম শ্রেণির পাঠ্যবইটি তৈরির কাজে জড়িত সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিবর্গের প্রতি এন সি ই আর টি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছে।

আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই জন ব্রেম্যান ও পার্থিব শাহুকে, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস, দিল্লি, ২০০৫, তাঁদের বই 'Working in the mill no more' থেকে বিভিন্ন ছবি নেওয়ার অনুমতি দেওয়ার জন্য। আমরা ধন্যবাদ জানাই অরবিন্দ সাধনা, একলব্য, মধ্যপ্রদেশ ও জন্মেজয় খুন্তিয়া, সিনিয়র লেকচারার, স্কুল অফ্ করসপন্ডেন্স্, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়।

এন সি ই আর টি বিশেষ ধন্যবাদ জানায় সবিতা সিন্‌হা মহোদয়াকে, অধ্যাপক এবং প্রধান ডি ই এস এস এইচ, তাঁর নিরবিচ্ছিন্ন সহায়তার জন্য।

সংস্থা দীনেশ কুমার, ইনচার্জ, কম্পিউটার বিভাগ, দীপেন্দ্র কুমার ও অচিন জৈন, ডি টি পি অপারেটার এবং দিলীপ কুমার অগাস্তি, প্রুফ রিডারকেও কৃতজ্ঞতা জানায়, বইটির সুন্দর রূপদানের জন্য। এন সি ই আর টি-এর প্রকাশনা বিভাগের এই বইটির প্রকাশনের জন্য আন্তরিক প্রচেষ্টা উচ্চ প্রশংসার দাবি রাখে।

মৌলিক কর্তব্য

(ভারতের সংবিধান, ধারা ৫১এ)

- সংবিধানের প্রতি আনুগত্য, সাংবিধানিক আদর্শ ও প্রতিষ্ঠান, জাতীয় পতাকা ও জাতীয় সংগীত সম্পর্কে শ্রদ্ধাবোধ।
- মহৎ যেসব আদর্শ স্বাধীনতা সংগ্রামে আমাদের উদ্‌বুদ্ধ করেছে তাদের লালন ও অনুসরণ।
- ভারতের সার্বভৌমত্ব, ঐক্য ও সংহতি রক্ষা।
- আহ্বান এলে দেশরক্ষা ও জাতির সেবায় আত্মনিয়োগ করা।
- ভাষা-ধর্ম-অঞ্চল-শ্রেণি নির্বিশেষে ভারতের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্যচেতনা ও ভ্রাতৃত্ববোধ উদ্‌বোধন।
- দেশের মিশ্র সংস্কৃতির মূল্যবান উত্তরাধিকারের মাহাত্ম্য উপলব্ধি ও সংরক্ষণ।
- অরণ্য, হ্রদ, নদনদী, বন্যজীবনসহ প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষণ ও উন্নয়ন এবং প্রাণীজগতের প্রতি সহানুভূতি পোষণ।
- বিজ্ঞানমনস্কতা, মানবতাবাদ, অনুসন্ধান ও সংস্কারের বিকাশ।
- সরকারি সম্পত্তি রক্ষা করা ও হিংসা পরিহার করা।
- জাতি যাতে নিয়ত তার কর্মোদ্যম ও সাফল্যের উচ্চতর স্তরে পৌঁছোতে পারে, জীবনের সর্বক্ষেত্রে ব্যক্তিগত ও সমবেত প্রয়াসে উৎকর্ষের সেই লক্ষ্যে পৌঁছোনোর প্রচেষ্টা।
- পিতা-মাতা ঃ অভিভাবকের দায়িত্ব ৬-১৪ বছর বয়স্ক শিশুদের শিক্ষার সুযোগের ব্যবস্থা করা।

আমাদের জাতীয় সংগীত

জন-গণ-মন- অধিনায়ক, জয় হে
ভারত-ভাগ্য-বিধাতা!
পঞ্জাব-সিন্ধু-গুজরাট- মরাঠা
দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গ
বিন্ধ্য-হিমাচল-যমুনা-গঙ্গা
উচ্ছল-জলধি-তরঙ্গ
তব শুভ নামে জাগে,
তব শুভ আশিস মাগে,
গাহে তব জয় গাথা।
জন-গণ-মঙ্গল-দায়ক জয় হে
ভারত-ভাগ্য-বিধাতা!
জয় হে, জয় হে, জয় হে,
জয় জয় জয়, জয় হে ॥

Our National Anthem, composed originally in Bangla by Rabindranath Tagore, was adopted in its Hindi version by the Constituent Assembly as the national anthem of India on 24 January 1950.

সূচিপত্র

ভূমিকা

প্রথম অধ্যায়

পালামপুর গ্রামের গল্প 1

দ্বিতীয় অধ্যায়

সম্পদ হিসাবে মানুষ 16

তৃতীয় অধ্যায়

দারিদ্র্য একটি সমস্যা 29

চতুর্থ অধ্যায়

ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা 42

১
অধ্যায়

পালমপুর গ্রামের গল্প
(The Story of Village Palampur)

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

উৎপাদন সম্পর্কে কিছু প্রাথমিক ধারণা প্রদানের জন্য "পালমপুর" নামক একটি কাল্পনিক গ্রামের উপস্থাপনা করা হল।

কৃষিকাজ পালমপুর গ্রামের প্রধান কাজ হলেও অন্যান্য কাজকর্ম যেমন ক্ষুদ্র প্রক্রিয়াকরণ শিল্প, দুগ্ধ উৎপাদন, পরিবহণ ইত্যাদি সামান্য মাত্রায় প্রচলিত আছে। এইসব উৎপাদনের কাজে বিভিন্ন ধরনের সম্পদের প্রয়োজন, যেমন - প্রাকৃতিক সম্পদ, মনুষ্যসৃষ্ট উপকরণ, অর্থ, মানুষের কর্মপ্রচেষ্টা ইত্যাদি। পালমপুরের গল্প হতে আমরা জানতে পারব, গ্রামে বিভিন্ন পণ্য ও সেবা উৎপাদনের জন্য কীভাবে বিভিন্ন সম্পদের সমন্বয় সাধন করা হয়ে থাকে।

চিত্র 1.1 *একটি গ্রামের দৃশ্য*

ভূমিকা

প্রতিবেশী গ্রামগুলির ও শহরগুলির সংগে পালমপুরের সুন্দর যোগাযোগ ব্যবস্থা রয়েছে। পালমপুর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে রয়েছে রাইগঞ্জ, যা একটি বড়ো গ্রাম। পালমপুরের সঙ্গে রাইগঞ্জ ও নিকটবর্তী ছোটো শহর শাহপুরের সব ঋতুতে চলন উপযোগী সড়ক যোগাযোগ রয়েছে। সড়কে বিভিন্ন ধরনের পরিবহণ ব্যবস্থা দেখা যায়, যেমন গোরুর গাড়ি, টংগা, গুড় ও অন্যান্য পণ্য বোঝাই মহিষের গাড়ি, মোটর সাইকেল, জিপগাড়ি, ট্র্যাক্টর ইত্যাদি।

এই গ্রামে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রায় 450টি পরিবার বসবাস করে। গ্রামে 80টি পরিবার রয়েছে উচ্চ সম্প্রদায়ের, যাদের মালিকানায় রয়েছে অধিকাংশ জমি। তাদের বাড়িগুলির মধ্যে বেশ কয়েকটি বাড়ি বড়ো যেগুলি ইটের ও সিমেন্টের আস্তরণে তৈরি কিছুটা বড়ো বাড়িতে থাকে। গ্রামের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মানুষ দলিত এবং গ্রামের এক কোণে মাটি ও খড়ের তৈরি ছোটো বাড়িতে থাকে। অধিকাংশ বাড়িতে বিদ্যুৎ সংযোগ রয়েছে। ছোটোখাটো ব্যাবসা বাণিজ্য এবং কৃষিক্ষেত্রের সমস্ত নলকূপ বিদ্যুৎশক্তিতে চালিত হয়। পালমপুরে দুইটি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও একটি উচ্চ বিদ্যালয় রয়েছে। গ্রামে একটি সরকারি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও একটি বেসরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্র রয়েছে যেখানে অসুস্থ মানুষের চিকিৎসা হয়।

- উপরিউক্ত বর্ণনা পালমপুর গ্রামের সড়ক, পরিবহণ, বিদ্যুৎ, কৃষি, বিদ্যালয়, সেচ ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্যকেন্দ্রের সুন্দর ও উন্নত ব্যবস্থাকে প্রদর্শন করছে। তোমাদের পার্শ্ববর্তী গ্রামের সাথে এইসব সুবিধাগুলির তুলনা করো।

পালমপুরের গল্প আমাদেরকে বিভিন্ন ধরনের উৎপাদন কার্যকলাপ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করবে। ভারতের সমস্ত গ্রামগুলিতে কৃষিই হচ্ছে প্রধান উৎপাদন কার্য। অন্যান্য উৎপাদন কার্যকলাপ যাকে বলে অকৃষি কার্যকলাপ, (Non-farming Activities) তার মধ্যে আছে - ক্ষুদ্রশিল্প, পরিবহণ, দোকানদারি ইত্যাদি। উৎপাদন সম্পর্কে কিছু সাধারণ বিষয়ে জানার পর আমরা উভয় ধরনের কার্যকলাপের উপর আলোকপাত করব।

* গিলবার্ট এটিনি (Gilbert Etienne) উত্তরপ্রদেশের পশ্চিম বুলান্দশা জেলার অন্তর্গত একটি গ্রামের উপর যে রিসার্চ করেছিলেন, এই গল্পটি আংশিকভাবে তার ওপর আধারিত।

উৎপাদনের উপকরণ

উৎপাদনের মূল লক্ষ্যই হল আমাদের প্রয়োজনীয় পণ্য ও সেবা উৎপাদন করা। পণ্য ও সেবা উৎপাদনের জন্য চারটি উপকরণের প্রয়োজন —

প্রথম উপকরণটি হল জমি (Land) ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন জল, বনজ সম্পদ, খনিজ সম্পদ ইত্যাদি।

দ্বিতীয় উপকরণ হল শ্রমিক (Labour) অর্থাৎ যারা কাজ করবে। কিছু উৎপাদনের জন্য উচ্চশিক্ষিত কর্মীর প্রয়োজন। অন্যান্য কাজের জন্য সাধারণ শ্রমিক প্রয়োজন যারা শারীরিক শ্রম প্রদান করবে। প্রত্যেক শ্রমিকই উৎপাদনের জন্য তাদের প্রয়োজনীয় শ্রম দেবে।

তৃতীয় উপকরণটি হল ভৌত মূলধন (Physical Capital) অর্থাৎ উপকরণের বিভিন্ন স্তরে যে ভিন্ন উপকরণ প্রয়োজন। কী কী বিষয় এই ভৌতিক মূলধনের মধ্যে আসে?

(a) যন্ত্রপাতি, মেশিন, বিল্ডিং : যন্ত্রপাতির মধ্যে আছে অতি সাধারণ যেমন কৃষকের লাঙল থেকে শুরু করে আধুনিক যন্ত্রপাতি যেমন জেনারেটার, কম্পিউটার, টারবাইন ইত্যাদি। যন্ত্রপাতি ও কারখানা ইত্যাদি দীর্ঘদিন উৎপাদনের কাজে ব্যবহার করা যায় এবং তাদের বলে স্থায়ী মূলধন ।

(b) কাঁচামাল ও অর্থ : উৎপাদনের কাজে বিভিন্ন কাঁচামালের প্রয়োজন হয়, যেমন - তাঁতির জন্য তুলো এবং কুমোরের জন্য কাদামাটির প্রয়োজন হয়। সাথে সাথে উৎপাদনের বিভিন্ন পর্যায়ে কিছু অর্থেরও প্রয়োজন হয় যা মজুরি প্রদান ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় উপাদান ক্রয় করতে ব্যবহৃত হয়। কাঁচামাল ও নগদ অর্থকে বলা হয় কার্যকরী মূলধন। কার্যকরী মূলধন, যন্ত্রাদি ও কলকারখানা প্রভৃতির মতো নয়, তা উৎপাদনের সাথে সাথে নিঃশেষিত হয়ে যায়।

এছাড়া, চতুর্থ একটি উপকরণেরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। নিজের ব্যবহার বা বাজারজাত করার উদ্দেশে পণ্য উৎপাদনের জন্য জমি, শ্রম ও ভৌতিক মূলধনকে একত্রিত করে উপযুক্ত সমন্বয়ের মাধ্যমে উৎপাদন কার্য পরিচালনার জন্য জ্ঞান ও উদ্যোগের প্রয়োজন। বর্তমানে তাকে বলা হয় মানব মূলধন (Human Capital)। পরবর্তী অধ্যায়ে মানব মূলধন সম্পর্কে আমরা আরও জানব।

- নীচের চিত্রে, জমি, শ্রম ও স্থির মূলধন যা উৎপাদনে ব্যবহার হচ্ছে তা চিহ্নিত করো।

চিত্র 1.2 *অনেক যন্ত্র ও শ্রমিকের সমন্বয়ে একটি কারখানা*

প্রতিটি উৎপাদন কার্যের জন্য, উৎপাদনের উপকরণগুলি - জমি, শ্রম, ভৌতিক মূলধন ও মানব মূলধনের মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়োজন। পালমপুরের কাহিনির মাধ্যমে আমরা প্রথম তিনটি উৎপাদনের উপকরণ সম্পর্কে বিষদে জানব। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা ভৌত মূলধনকে (Physical Capital) মূলধন রূপে বিবেচনা করব।

পালামপুরের কৃষি

1. জমির পরিমাণ স্থির

কৃষি হল পালমপুরের প্রধান উৎপাদন কার্য। কর্মরত লোকেদের 75 শতাংশ জীবিকার্জনের জন্য কৃষির উপর নির্ভরশীল। তারা হয় কৃষক বা কৃষি শ্রমিক। এইসব লোকেদের ভালোমন্দ নিবিড়ভাবে কৃষি উৎপাদনের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

কিন্তু কৃষি উৎপাদনের বৃদ্ধির সাথে একটি মৌলিক বাধা রয়েছে। বাস্তবে কৃষি জমির পরিমাণ স্থির। 1960 সাল থেকে

পালমপুরে কৃষিজ জমির পরিমাণ বৃদ্ধি পায়নি। এর মধ্যে কিছু পতিত জমিকে কৃষিজমিতে রূপান্তরিত করা হয়েছে। নতুন করে কৃষিজমির পরিমাণ বৃদ্ধি করে কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন বৃদ্ধির আর কোনো সুযোগ নেই।

জমি পরিমাপের প্রামাণ্য একক হল হেক্টর (Hectare)। যদিও গ্রামীণ এলাকায় জমি পরিমাপের বিভিন্ন স্থানীয় একক ব্যবহার হয়। যেমন - বিঘা, শতক ইত্যাদি। 100 মিটার বাহুবিশিষ্ট বর্গাকার জমি হল এক হেক্টর। তোমরা কি এক হেক্টর জমির সাথে তোমার বিদ্যালয়ের মাঠের তুলনা করতে পারবে?

2. একই জমি থেকে অধিক উৎপাদনের কোনো উপায় আছে কি ?

শস্য উৎপাদন ও সুযোগসুবিধার নিরিখে পালমপুর হল উত্তরপ্রদেশের পশ্চিম অংশের একটি অনুরূপ গ্রামের মতো। পালমপুরের সমস্ত জমিতে কৃষিকাজ হয়। কোনো জমিই অব্যবহৃত অবস্থায় নেই। বর্ষাকালে (খারিফ মরশুম) কৃষকরা জোয়ার এবং বাজরা উৎপাদন করে। এইসব উদ্ভিদ গবাদি পশুর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এর পরবর্তী পর্যায়ে অক্টোবর ও ডিসেম্বর মাসের মধ্যে আলু চাষ হয়। শীতের মরশুমে (রবি মরশুম) গমের চাষ হয়। উৎপাদিত গম হতে কৃষকরা নিজের ভোগের জন্য যথেষ্ট পরিমাণে মজুত রেখে উদ্‌বৃত্ত গম রাইগঞ্জ বাজারে বিক্রি করে। কৃষিজমির একাংশ আখ চাষে ব্যবহার করা হয় যা বছরে একবার কাটা হয়। কাঁচা আখ বা তালমিছরি শাহপুরের ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করা হয়।

পালমপুরে উন্নত জলসেচ ব্যবস্থার জন্য কৃষকরা বছরে তিন ধরনের শস্য উৎপাদন করতে সমর্থ হয়। পালমপুরে পূর্বেই বিদ্যুৎ ছিল। এর ফলস্বরূপ জলসেচ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। পূর্বে গ্রাম্য কুয়ো থেকে জল তুলে ছোটো ছোটো খেতগুলিতে জলসেচ করা হত। কিন্তু মানুষ লক্ষ করল যে বিদ্যুৎচালিত নলকূপের সাহায্যে অনেক বেশি জমিতে দক্ষতার সাথে জলসেচ করা যায়। সরকার প্রথম কয়েকটি নলকূপ স্থাপন করেছিল। এরপর কৃষকরা স্বউদ্যোগে নলকূপ স্থাপন করতে শুরু করেছিল। ফলস্বরূপ, 1970-এর দশকের মধ্যভাগে 200 হেক্টরের সম্পূর্ণ এলাকা জলসেচের আওতায় এসে যায়।

ভারতের সবগ্রামে জলসেচের উন্নত ব্যবস্থা নেই। নদী তীরবর্তী, সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলে জলসেচ ব্যবস্থা খুব উন্নত। তুলনায় মালভূমি অঞ্চলে বিশেষত দাক্ষিণাত্যের মালভূমিতে সেচ ব্যবস্থা খুবই অনুন্নত। দেশে বর্তমানে 40 শতাংশেরও কম জমি সেচের আওতায় রয়েছে। অবশিষ্ট অংশে কৃষি মূলত বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল।

একই জমিতে বছরে একের বেশি ফসল উৎপাদন পদ্ধতিকে বলে বহুফসলি চাষ (Multiple Cropping)। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ জমিতে উৎপাদন বৃদ্ধির একটি সাধারণ পদ্ধতি হল বহুফসলি চাষ। পালমপুরের সমস্ত কৃষক বিগত 15 থেকে 20 বছরে একই জমিতে বছরে কমপক্ষে দুটি মুখ্য ফসল উৎপাদন করে, অনেকে আবার তৃতীয় ফসল হিসাবে আলু চাষ করে।

চিত্র 1.3 *বিভিন্ন শস্য*

চলো আলোচনা করি

- সারনি 1.1 দেখাচ্ছে ভারতে আবাদি জমির পরিমাণ (মিলিয়ন হেক্টর এককে)। রেখাচিত্রে তা অঙ্কন করো। রেখাচিত্র থেকে কী দেখা যাচ্ছে? শ্রেণিকক্ষে তা ব্যাখ্যা করো।

সারণি 1.1: বহুবছরের আবাদি জমির পরিমাণ

	আবাদি জমির পরিমাণ (মিলিয়ন হেক্টর)
1950	120
1960	130
1970	140
1980	140
1990	140
2000	140
2010	155
2012	155

উৎস : State of Indian Agriculture 2015-16; Directorate of Economics and Statistics, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare.

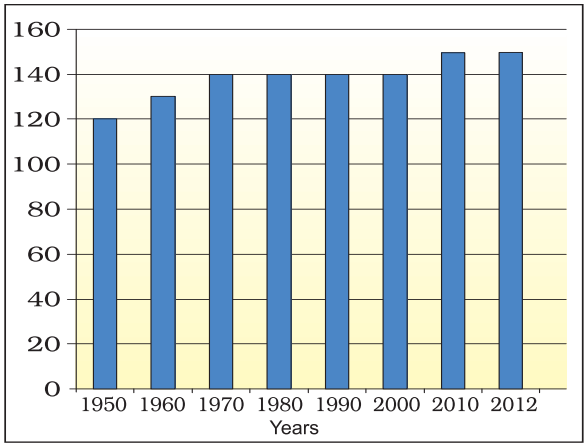

- জলসেচের আওতাধীন জমির পরিমাণ কি বৃদ্ধি প্রয়োজন? কেন?
- তোমরা পালমপুরে শস্য উৎপাদন সম্পর্কে পড়েছ। তোমার নিজের অঞ্চলে যেসব শস্য উৎপাদন হয় তার তথ্যের ভিত্তিতে নীচের সারণিটি পূরণ করো।

উপরের আলোচনা থেকে তোমারা দেখেছ, একই জমি থেকে উৎপাদন বৃদ্ধির একটি উপায় হল বহুফসলি চাষ পদ্ধতি। উন্নত ফলনের অন্য একটি উপায় হল আধুনিক কৃষি পদ্ধতিতে চাষ। এই পদ্ধতিতে কোনো একটি নির্দিষ্ট জমিতে একটি মরশুমে উৎপাদিত ফসলের পরিমাপ করা হয়। 1960-এর দশকের মধ্যভাগ পর্যন্ত চিরাচরিত বীজে চাষাবাদ করা হত তাতে উৎপাদন কম হত। চিরাচরিত বীজে কম জলসেচের প্রয়োজন হত। কৃষকরা জমির সার হিসাবে গোবর ও অন্যান্য জৈব সার ব্যবহার করত। এইসব উপকরণ কিছুই বাজার হতে কেনা হত না এবং তা কৃষকরা নিজেরাই তৈরি করত।

1960 এর দশকের শেষের দিকে ভারতীয় কৃষকরা উচ্চফলনশীল (HYV) গম ও ধানবীজ ব্যবহারের মাধ্যমে সবুজ বিপ্লবের সূচনা করে। চিরাচরিত বীজের তুলনায় উচ্চফলনশীল (HYV) বীজের একটি গাছ থেকেই অনেক বেশি পরিমাণ ফলন পাওয়া যায়। ফলস্বরূপ, সমপরিমাণ জমি এখন পূর্বের উৎপাদনের অপেক্ষায় অনেক বেশি পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদন করতে পারে। যদিও উচ্চফলনশীল (HYV) বীজের ক্ষেত্রে পর্যাপ্ত জলসেচ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশকের প্রয়োজন হয়।

চিত্র 1.4 *আধুনিক কৃষিকাজ পদ্ধতি : উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার প্রভৃতি*

শস্যের নাম	বীজবপনের মাস	ফসল তোলার মাস	জলসেচের উৎস (বৃষ্টি, চৌবাচ্চা, নলকূপ, খাল ইত্যাদি।)

উচ্চফলনশীল বীজ, জলসেচ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক প্রভৃতির সমন্বয়ে অধিক উৎপাদন সম্ভব।

পরীক্ষামূলকভাবে ভারতে প্রথম পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশের কৃষকরা আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ শুরু করেছিল। ঐসব অঞ্চলের কৃষকরা জলসেচের জন্য নলকূপ স্থাপন করেছিল এবং কৃষিতে উচ্চফলনশীল বীজ, রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহার করেছিল। এদের মধ্যে কেউ কেউ কৃষি যন্ত্রপাতি যেমন ট্র্যাক্টর ও ঝাড়াই যন্ত্র (Thresher) ক্রয় করেছিল। যার সাহায্যে দ্রুত জমি কর্ষণ ও ফসল সংগ্রহ করা যেত। এর পুরস্কার স্বরূপ তারা অধিক গম উৎপাদন করেছিল।

চিরাচরিত চাষাবাদ পদ্ধতিতে পালমপুরে প্রতি হেক্টরে গমের উৎপাদন ছিল 1300 কিলোগ্রাম। উচ্চফলনশীল বীজ ব্যবহার করায় এই উৎপাদন বেড়ে হয়েছিল প্রতি হেক্টরে 3200 কিলোগ্রাম। তাই সেখানে গমের উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছিল। কৃষকদের কাছে গমের বাজারে বিক্রয়যোগ্য উদ্বৃত্ত বৃদ্ধি পেয়েছিল।

চলো আলোচনা করি

- বহুফসলি চাষ ও আধুনিক কৃষি পদ্ধতির মধ্যে পার্থক্য কী ?
- নীচের সারণিতে দেখা যাচ্ছে সবুজ বিপ্লবের পর ভারতে গম ও ডালের (প্রতি মিলিয়ন টন এককে) উৎপাদনের পরিমাণ। রেখাচিত্রে তা চিত্রায়ন করো। সবুজ বিপ্লব কি ওই দুই শস্যের উৎপাদনের ক্ষেত্রে সমানভাবে সফল হয়েছে? আলোচনা করো।
- আধুনিক কৃষি পদ্ধতি ব্যবহারের জন্য কৃষকের কী ধরনের কার্যকরী মূলধন প্রয়োজন?

সারণি 1.2 : ডাল ও গমের উৎপাদন (টনে)

	ডালের উৎপাদন	গমের উৎপাদন
1965 - 66	10	10
1970 - 71	12	24
1980 - 81	11	36
1990 - 91	14	55
2000 - 01	11	70
2010 - 11	18	87
2012 - 13	18	94
2013 - 14	19	96
2014 - 15	17	89
2015 - 16	17	94

উৎস : স্টেট অব ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচার 2016; অর্থনীতি ও পরিসংখ্যান পরিচালন দপ্তর, কৃষি বিভাগ, কৃষক কল্যাণ ও সহযোগিতা।

- আধুনিক কৃষি পদ্ধতিতে কৃষককে পূর্বের চেয়ে বেশি নগদ অর্থের প্রয়োজন। কেন?

প্রস্তাবিত কার্যক্রম :-

- তোমার এলাকার ক্ষেত্র পরিদর্শনকালে কয়েকজন কৃষকের সাথে আলোচনা করো। অনুসন্ধানের চেষ্টা করো :-

1. কৃষকরা কী ধরনের কৃষি পদ্ধতির ব্যবহার করছে — আধুনিক বা চিরাচরিত বা মিশ্র? টীকা লেখো।
2. জলসেচের উৎস কী?
3. কী পরিমাণ আবাদি জমিতে জলসেচ হচ্ছে? (খুব স্বল্প / প্রায় অর্ধেক / বেশির ভাগ অংশ / সব)
4. কৃষকরা তাদের প্রয়োজনীয় উপকরণ কোথা থেকে সংগ্রহ করছে?

3. জমি কি সহনশীল?

জমি যেহেতু একটি প্রাকৃতিক সম্পদ, তাই তা ব্যবহারের ক্ষেত্রে মনযোগী হতে হবে। বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধানের তথ্য থেকে জানা যায় যে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থায় প্রাকৃতিক সম্পদের অধিক ব্যবহার হচ্ছে।

অনেকক্ষেত্রে অত্যধিক রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে জমির উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পাচ্ছে। সাথে সাথে সেচ ব্যবস্থায়, ভূগর্ভস্থ জল উত্তোলনের জন্য জমির জলস্তর হ্রাস পাচ্ছে। পরিবেশগত সম্পদ যেমন ভূমির উর্বরতা ও ভূমির জলস্তর তৈরি হতে অনেক বছরের প্রয়োজন। একবার তা ধ্বংস হয়ে গেলে তা পূনঃনবীকরণ খুবই কঠিন ব্যাপার। ভবিষ্যৎ কৃষি উন্নয়নের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই পরিবেশের প্রতি যত্নবান হতে হবে।

প্রস্তাবিত কার্যক্রম :-

- সংবাদপত্র / ম্যাগাজিন থেকে প্রাপ্ত নীচের রিপোর্ট পড়ে নিজের ভাষায় কৃষি মন্ত্রীর কাছে চিঠি লেখো যে কীভাবে রাসায়নিক সার ব্যবহার বিপজ্জনক হচ্ছে।

রাসায়নিক সার থেকে যে খনিজ পাওয়া যায় তা জলে দ্রবীভূত হয়ে সহজেই গাছে পৌঁছে যায়। কিন্তু তা দীর্ঘক্ষণ জমি নাও ধারণ করতে পারে। তা মাটি থেকে

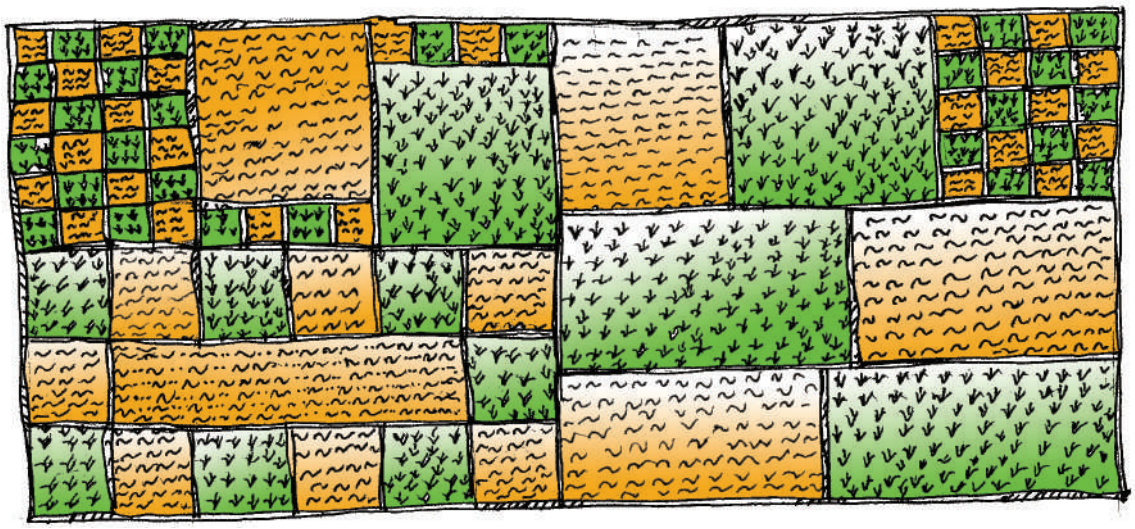

চিত্র 1.5 *পালমপুর গ্রাম : চাষকৃত জমির বণ্টন*

মুক্ত হয়ে যেতে পারে এবং ভূগর্ভস্থ জল, নদীকে দূষিত করতে পারে। রাসায়নিক সার মাটিতে থাকা ব্যাকটেরিয়া ও সুক্ষ্ম জীবকে (Micro organism) ধ্বংস করে। অর্থাৎ একটি সময় পর আগের তুলনায় জমির উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাবে .... (উৎস ঃ Down to Earth, New Delhi)

.... রাসায়নিক সারের ব্যবহারের ক্ষেত্রে দেশের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে পাঞ্জাব। ক্রমাগত রাসায়নিক সারের ব্যবহারের ফলে জমির স্বাস্থ্যের অবনতি হচ্ছে। পাঞ্জাবের কৃষকরা আরও বেশি বেশি রাসায়নিক সার ও অন্যান্য উপকরণ ব্যবহার করতে বাধ্য হচ্ছে যাতে করে তাঁদের একই উৎপাদন স্তর বজায় থাকে। যেহেতু কৃষিকার্যে খরচ খুব দ্রুত হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে ... (উৎস : The Tribune, Chandigarh)

4. পালমপুরে কৃষকদের মধ্যে কীভাবে জমি বণ্টন করা হয়েছে?

তোমরা নিশ্চয় অনুভব করতে পারছ কৃষির জন্য জমি কতটা গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে গ্রামের সমস্ত জনগণ কৃষিকার্যের জন্য পর্যাপ্ত জমি পায়নি। পালমপুর গ্রামে 450টি পরিবারের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ ভূমিহীন, অর্থাৎ 150 পরিবার যাদের বেশির ভাগ দলিত তাদের কৃষিকার্যের জন্য কোনো জমি নেই।

বাকি যেসব পরিবারের জমি রয়েছে তাদের মধ্যে 240টি পরিবারের 2 হেক্টরেরও কম আয়তনের জমি রয়েছে। এইসব ক্ষুদ্র আয়তনের জমি হতে কৃষক পরিবারগুলি যথেষ্ট উপার্জন করতে পারে না।

1960 সালে, গোবিন্দ একজন কৃষক ছিল যার 2.25 হেক্টর জমি ছিল যার বেশির ভাগ সেচহীন। তার তিন পুত্রের সাহায্যে গোবিন্দ ঐ জমি চাষ করত। যদিও তারা স্বাচ্ছন্দে জীবনযাপন করতে পারত না, তারপরও তারা তাদের একটি মহিষের থেকে প্রাপ্ত কিছু অতিরিক্ত আয় হতে পরিবারের ভরণ-পোষণ করত। কয়েক বছর পর গোবিন্দের মৃত্যুর পর ঐ জমি তিন পুত্রের মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। প্রত্যেকের ভাগে যে জমি পরে তার পরিমাণ মাত্র 0.75 হেক্টর। অত্যাধুনিক সেচব্যবস্থা ও আধুনিক কৃষি পদ্ধতি ব্যবহার করেও গোবিন্দের পুত্ররা জমি থেকে তাদের জীবিকা নির্বাহ করতে পারত না। বছরের বিভিন্ন সময় তাদের অতিরিক্ত কাজের সন্ধান করতে হত।

চিত্রে তোমরা দেখতে পাচ্ছ বিশাল সংখ্যক ক্ষুদ্র জোতজমি গ্রামে বিক্ষিপ্তভাবে অবস্থিত। ক্ষুদ্র চাষিরা ওইসব জমি চাষ করে থাকে। অন্যদিকে, গ্রামের অর্ধেকেরও বেশির ভাগ জায়গা জুড়ে বড়ো জোতজমি রয়েছে। পালমপুরে মাঝারি ও বৃহৎ কৃষক পরিবার রয়েছে 60টি যারা 2 হেক্টরেরও বেশি জমি চাষ করে । কিছু কিছু বৃহৎ কৃষকের জমির পরিমাণ 10 হেক্টর বা তার বেশি।

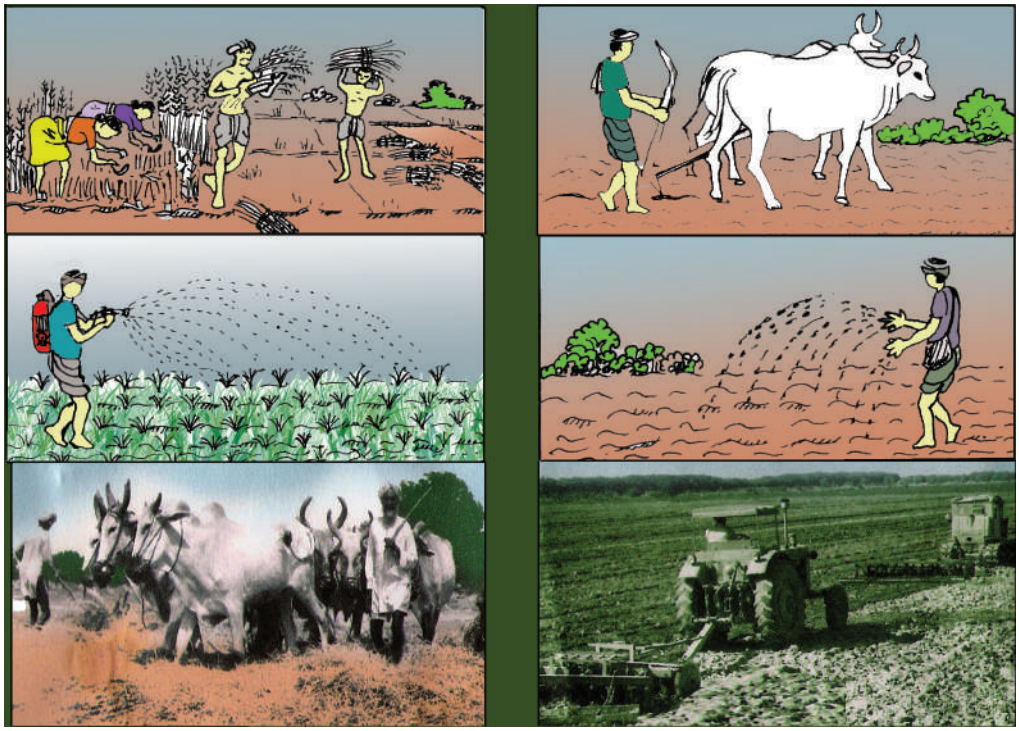

চিত্র 1.6 : *মাঠে কর্মরত : (গম শস্য) বলদের সাহায্যে জমি চাষ, বীজবপন, কীটনাশক ছড়ানো হচ্ছে, চিরাচরিত প্রথায় চাষাবাদ, আধুনিক পদ্ধতিতে চাষাবাদ, ফসল কাটা হচ্ছে।*

চলো আলোচনা করি

- 1.5 নং চিত্রে, ক্ষুদ্র কৃষকদের জমিগুলি কি তুমি চিহ্নিত করতে পারো?
- কেন অনেকগুলি কৃষক পরিবার ক্ষুদ্র আয়তনের জমি চাষ করে?
- নীচের লেখচিত্রে (1.1) ভারতের কৃষক ও তাদের কর্ষিত জমি পরিমাণের বিন্যাস দেওয়া হল। শ্রেণিকক্ষে তা ব্যাখ্যা করো।

***লেখচিত্র* 1.1:** *চাষকৃত জমির বণ্টন এবং কৃষক*

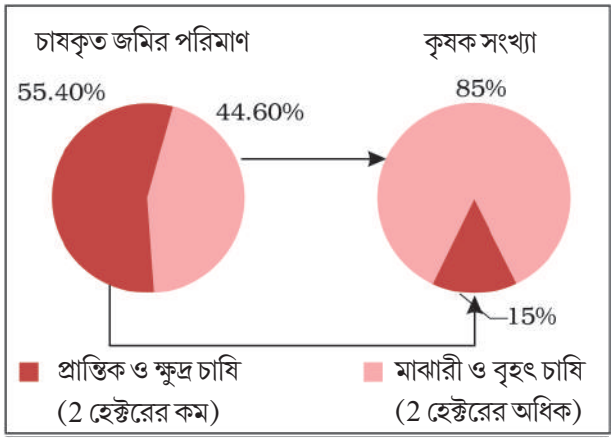

উৎস : পকেট বুক অফ্ এগ্রিকালচার স্ট্যাটিসটিক্স 2015 এন্ড স্টেইট অফ্ ইন্ডিয়ান এগ্রিকালচার 2015, কৃষি বিভাগ, কৃষককল্যাণ ও সহযোগিতা।

চলো আলোচনা করি

- তোমরা কি মনে কর পালমপুরে কর্ষিত জমির বণ্টন অসম? অনুরূপ চিত্র কি ভারতে দেখা যায়? ব্যাখ্যা করো।

5. কে শ্রম দেবে?

জমির পর শ্রম হচ্ছে উৎপাদনের প্রয়োজনীয় উপকরণ। কৃষিকাজে প্রচুর পরিশ্রমের প্রয়োজন হয়। ক্ষুদ্র কৃষকরা তাদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে তাদের নিজের জমিতে চাষাবাদ করে। তাই কৃষিকার্যে তারা নিজেরাই প্রয়োজনীয় শ্রমের যোগান দেয়। মাঝারি ও বড়ো কৃষকরা তাদের চাষাবাদের জন্য কৃষি শ্রমিক নিয়োগ করে।

চলো আলোচনা করি

- 1.6 চিত্রে, মাঠে যেসব কাজ হচ্ছে তা চিহ্নিত করো এবং সেগুলি সঠিক ক্রমে সাজাও।

কৃষিশ্রমিকরা ভূমিহীন পরিবার বা সামান্য পরিমাণ জমির অধিকৃত কৃষক পরিবার হতে আসে। কৃষকদের মতো কৃষি শ্রমিকদেরও তাদের জমিতে উৎপাদিত ফসলের অধিকার থাকে

চিত্র 1.7 *ডালা ও রামকলির মধ্যে কথোপকথন*

না। পরিবর্তে, কৃষকদের কাছ থেকে তারা মজুরি পায় যাদের জন্য তারা শ্রম দেয়। মজুরি নগদে বা পণ্যের মাধ্যমে যেমন- শস্য দেওয়া হতে পারে। অনেক সময় শ্রমিকদের খাবারও দেওয়া হয়। অঞ্চল ভেদে, শস্য ভেদে, কৃষি কর্মকাণ্ড ভেদে (যেমন বীজবপন ও ফসল তোলা) মজুরির ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে।

নিয়োগের সময়কাল ভেদেও মজুরির ব্যাপক ভিন্নতা রয়েছে। একজন কৃষিশ্রমিক দৈনিক ভিত্তিতে বা কোনো নির্দিষ্ট কৃষি কার্যকলাপ যেমন ফসল তোলা বা সারা বছরের জন্য নিয়োগ হতে পারে।

ডালা একজন ভূমিহীন কৃষিশ্রমিক যে পালমপুরে দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কাজ করে। এর মানে হচ্ছে তাকে অবশ্যই নিয়মিত কাজের সন্ধানে থাকতে হয়। ভারত সরকার দ্বারা

একজন কৃষিশ্রমিকের ন্যূনতম দৈনিক মজুরি ধার্য করা হয়েছে 115 টাকা (April, 2011), কিন্তু ডালা মাত্র 40 টাকা পায়। পালমপুরে কাজের জন্য শ্রমিকদের মধ্যে প্রচণ্ড প্রতিযোগিতা চলে, তাই শ্রমিকরা কম মজুরিতে কাজে আগ্রহী থাকে। ডালা তার অবস্থা সম্পর্কে রামকলির কাছে অভিযোগ করে, রামকলি অন্য একজন কৃষিশ্রমিক। ডালা ও রামকলি উভয়ই গ্রামের দরিদ্রতম লোকদের মধ্যে একজন।

চলো আলোচনা করি

- ডালা এবং রামকলির মতো কৃষিশ্রমিকরা কেন গরিব?
- গোঁসাইপুর আর মাজাওলি হল দক্ষিণ বিহারের দুটি গ্রাম। দুটি গ্রামের মোট ৮৫০টি পরিবারের মধ্যে, ২৫০ এরও বেশি পুরুষ সদস্য গ্রামীণ পাঞ্জাব, হরিয়ানা বা দিল্লি, মুম্বাই, সুরাট, হায়দ্রাবাদ বা নাগপুরে কাজে নিয়োজিত আছে। ত্রিপুরার বিভিন্ন গ্রামের শিক্ষিত ছেলে-মেয়েরা মুম্বাই, চেন্নাই, দিল্লি ও ব্যাঙ্গালোরে আই টি সেক্টরে কাজ করছে। এইরূপ রাজ্যান্তরের (migration) ব্যাপারটা ভারতের প্রায় প্রতি গ্রামেই সাধারণ বিষয়। কেন লোক এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়? তোমরা কি (তোমাদের ধারণা থেকে) ব্যাখ্যা করতে পারো যে গোঁসাইপুর ও মাজাওলির অভিবাসীরা গন্তব্যস্থলে কী কাজ করতে পারে?

6. কৃষিকাজে প্রয়োজনীয় মূলধন :

তোমরা ইতোমধ্যে দেখেছ যে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থায় প্রচুর মূলধন প্রয়োজন, তাই কৃষকদের এখন পূর্বের তুলনায় অনেক বেশি অর্থের প্রয়োজন।

1. বেশিরভাগ ক্ষুদ্র চাষিদের মূলধনের জন্য অর্থ ধার করতে হয়। তারা হয় বড়োচাষি বা গ্রামীণ ঋণ প্রদানকারী বা যারা কৃষিকাজের বিভিন্ন উপকরণ সরবরাহ করে তাদের থেকে ঋণ নেয়। সুদের হার ওইসব ঋণের ক্ষেত্রে খুব বেশি হয়। তারা ওই ঋণ ফেরত দিতে গিয়ে ভীষণ অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়।

সবিতা একজন ক্ষুদ্র চাষি। সে তার এক একর জমিতে গমচাষের পরিকল্পনা করে। বীজ, সার ও কীটনাশকের সাথে সাথে জল কেনা ও কৃষি উপকরণ মেরামতের জন্য নগদ অর্থের প্রয়োজন। সে হিসাব করে দেখল তার 3000 টাকার প্রয়োজন। তাই সে স্থির করল একজন ধনী কৃষক তেজপাল সিংয়ের কাছ থেকে ধার নেবে। তেজপাল সিং সবিতাকে চার মাসের জন্য 24% সুদের হারে ধার দিতে রাজি হন, যা ছিল খুবই উচ্চ সুদের হার। সবিতাও প্রতিজ্ঞা করল যে ফসল কাটার মরশুমে তার জমিতে দৈনিক 35 টাকার বিনিময়ে কৃষিশ্রমিক হিসাবে কাজ করবে। তোমরা বলতে পারো, এই মজুরি খুব কম। সবিতা জানে যে তা নিজের জমিতে ফসল তোলার কাজে তাকে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। তারপর তাকে তেজপাল সিংয়ের জমিতে কৃষিশ্রমিক হিসাবে শ্রম দিতে হবে। ফসল তোলার সময় হল সবচেয়ে ব্যস্ততম সময়। তিন সন্তানের মা হিসাবে তার অনেক সাংসারিক দায়বদ্ধতা রয়েছে। সে কঠিন সবকিছুই করতে রাজি আছে কারণ সে জানে ক্ষুদ্র চাষির ঋণ পাওয়া কঠিন।

2. ছোটো চাষিদের তুলনায় মাঝারি ও বড়ো চাষিদের কৃষিকাজের জন্য তাদের নিজেদের সঞ্চয় রয়েছে। তাই তারা তাদের প্রয়োজনীয় মূলধন জোগাড় করতে পারে। কীভাবে এই কৃষকদের নিজেদের সঞ্চয় রয়েছে পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এই উত্তর খুঁজে নেব।

এই পর্যন্ত আলোচিত কাহিনির একটু আলোচনা করা যাক

আমরা উৎপাদনের তিনটি উপকরণ - জমি, শ্রম ও মূলধনের এবং কৃষিকাজে তাদের ব্যবহার সম্পর্কে জেনেছি। নীচের শূন্যস্থানগুলি পূরণ করো।

ওই তিনটি উপকরণের মধ্যে শ্রমকে সবচেয়ে পর্যাপ্ত উপকরণ হিসাবে পাওয়া গেছে। একটি গ্রামে কৃষিমজুর হিসাবে কাজ করার জন্য ইচ্ছুক বহু লোক রয়েছে, কিন্তু কাজের সুযোগ সীমিত। তারা হয় ভূমিহীন পরিবারের অন্তর্গত বা ____। তাদের কম মজুরি দেওয়া হয় এবং তারা কষ্টকর জীবনযাপন করে।

অন্যদিকে শ্রমের তুলনায়, ____ একটি দুষ্প্রাপ্য উৎপাদনের উপকরণ। আবাদিকৃত জমির পরিমাণ ____। এমনকি প্রাপ্ত জমিও কৃষিকাজে নিযুক্ত জনগণের মধ্যে ____ (সমভাবে / অসমভাবে) বণ্টিত। এক বিশাল সংখ্যক চাষি রয়েছে যারা ছোটো ছোটো

জোতজমি চাষ করে এবং ভূমিহীন কৃষিশ্রমিকদের চেয়ে ভালোভাবে জীবনযাপন করতে পারে না। প্রাপ্ত জমির সর্বোচ্চ ব্যবহারের জন্য কৃষকরা _____ এবং _____ ব্যবহার করে। উভয়ই শস্য উৎপাদনে বৃদ্ধি ঘটায়।

আধুনিক কৃষি পদ্ধতির জন্য প্রয়োজন বিপুল পরিমাণ _____। সাধারণ ছোটো চাষিরা মূলধন জোগাড়ের জন্য ঋণ নিতে বাধ্য হয় এবং তা শোধ করতে গিয়ে সংকটের সম্মুখীন হয়। সুতরাং মূলধনও একটি দুষ্প্রাপ্য উপকরণ, বিশেষত ক্ষুদ্র চাষিদের ক্ষেত্রে। যদিও জমি ও মূলধন উভয়ই সীমিত, এই দুটি উপকরণের মধ্যে একটি বুনিয়াদি পার্থক্য রয়েছে। _____ একটি প্রাকৃতিক সম্পদ, যেখানে _____ মানব উৎপাদিত। মূলধনকে কি বাড়ানো সম্ভব, যেখানে জমি স্থির উপকরণ। তাই এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে কৃষিতে ব্যবহৃত জমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের যথাযথ ব্যবহার সম্পর্কে আমরা সচেতন থাকব।

7. উদ্‌বৃত্ত কৃষি পণ্যের বিক্রয়

ধরা যাক কৃষকরা উৎপাদনের তিনটি উপকরণ ব্যবহার করে নিজ হাতে গম উৎপাদন করে। গম কাটার পর উৎপাদন প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হয়। কৃষকরা এই গম নিয়ে কী করবে? উৎপাদিত গমের একাংশ তারা নিজেদের পারিবারিক ব্যবহারের জন্য রেখে উদ্‌বৃত্ত অংশ বিক্রি করবে। সবিতা ও গোবিন্দের পুত্রের মতো ক্ষুদ্র চাষিদের সামান্য পরিমাণ গম কিছু উদ্‌বৃত্ত থাকে, কারণ তাদের মোট উৎপাদন কম এবং এর বেশির ভাগ অংশ তাদের পরিবারের প্রয়োজনের জন্য রাখা হয়। তাই মাঝারি ও বড়ো চাষিরা বাজারে গম সরবরাহ করে। 1.1 নং চিত্রে তোমরা দেখেছ গোরুর গাড়ি ভর্তি গমের বোঝা বাজারে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ব্যবসায়ীরা এই গম বাজার থেকে কিনে পুনরায় শহর ও গ্রামের দোকানদারদের কাছে বিক্রি করে।

ধনী কৃষক তেজপাল সিং এর কাছে তার সমস্ত জমি থেকে প্রাপ্ত 350 কুইন্টাল উদ্‌বৃত্ত গম রয়েছে। সে তার উদ্‌বৃত্ত গম রাইগঞ্জ বাজারে বিক্রি করে এবং ভালো রোজগার করে।

তেজপাল সিং তার আয় দিয়ে কী করবে? গতবছর তেজপাল সিং তার বেশির ভাগ অর্থ ব্যাংকে জমা রেখেছিল। পরবর্তী সময়ে সে এই টাকা সবিতার মতো কৃষকদের ঋণ হিসাবে দিতে ব্যবহার করে যাদের ঋণের প্রয়োজন। সে পরবর্তী মরশুমের কৃষিকাজের প্রয়োজনীয় কার্যকরী মূলধন হিসাবে টাকা ব্যবহার করেছিল। এই বছর তেজপাল সিং তার উপার্জন অপর একটি ট্র্যাক্টর কিনতে ব্যবহার করার কথা পরিকল্পনা করছে। অপর ট্র্যাক্টরটি তার স্থির মূলধন বৃদ্ধি করবে।

তেজপাল সিং এর মতো অন্য বড়ো ও মাঝারি চাষিরাও তাদের উদ্‌বৃত্ত উৎপাদন বিক্রি করে। আয়ের একাংশ তারা সঞ্চয় করে এবং পরবর্তী মরশুমে মূলধন ক্রয়ে ব্যবহার করে। কিছু কৃষক তাদের সঞ্চয় গবাদি পশু, ট্রাক বা দোকান দিতে ব্যবহার করতে পারে। এইগুলি কৃষি বহির্ভূত কাজকর্মের মূলধন সৃষ্টি করে।

পালমপুরে কৃষি বহির্ভূত কাজকর্ম

আমরা জেনেছি যে কৃষিকাজ হচ্ছে পালমপুরের প্রধান উৎপাদন কাজ। আমরা এখন কিছু কৃষি বহির্ভূত কার্যকলাপের উপর আলোকপাত করব। পালমপুরে মাত্র 25 শতাংশ লোক কৃষি বহির্ভূত ক্ষেত্রে নিয়োজিত আছে।

1. দুগ্ধ উৎপাদন (Dairy) — অন্যান্য সাধারণ কার্যকলাপ

পালমপুরে অনেক পরিবারেরই একটি সাধারণ কাজ হল দুগ্ধ উৎপাদন। সেখানকার মানুষ তাদের মহিষদের বিভিন্ন ধরনের ঘাস, জোয়ার ও বাজরা খাওয়ায় যেগুলি বর্ষাকালে জন্মায়। দুধ নিকটবর্তী বড়ো গ্রাম রাইগঞ্জ-এ বিক্রি করা হয়। শাহপুর শহরের দুজন ব্যবসায়ী রায়গঞ্জে একটি দুধ সংগ্রহশালা ও শীতলীকরণ কেন্দ্র খুলেছে যেখান থেকে দুধ দূরবর্তী শহর ও নগরগুলিতে সরবরাহ করা হয়।

চলো আলোচনা করি

- ধরা যাক তিনজন কৃষক আছেন। প্রত্যেকেই জমিতে গম ফলিয়েছে যদিও তাদের উৎপাদন ভিন্ন (2 নং স্তম্ভ)। প্রত্যেক কৃষক পরিবারে গমের ব্যবহার সমান (3 নং স্তম্ভ)। এই বছরের গমের সম্পূর্ণ উদ্‌বৃত্ত পরবর্তী বছরের মূলধন হিসাবে ব্যবহার করা হয়। আরও ধরা যাক, উৎপাদনের পরিমাণ উৎপাদনে ব্যবহৃত মূলধনের দ্বিগুণ।

1 নং কৃষক

	উৎপাদন	ভোগ	উদ্‌বৃত্ত = উৎপাদন — ভোগ	পরের বছরের জন্য মূলধন
প্রথম বছর	100	40	60	60
দ্বিতীয় বছর	120	40		
তৃতীয় বছর		40		

2 নং কৃষক

	উৎপাদন	ভোগ	উদ্‌বৃত্ত	পরের বছরের জন্য মূলধন
প্রথম বছর	80	40		
দ্বিতীয় বছর		40		
তৃতীয় বছর		40		

3 নং কৃষক

	উৎপাদন	ভোগ	উদ্‌বৃত্ত	পরের বছরের জন্য মূলধন
প্রথম বছর	60	40		
দ্বিতীয় বছর		40		
তৃতীয় বছর		40		

চলো আলোচনা করি

- তিন জন কৃষকের বছরব্যাপী গম উৎপাদনের তুলনা করো।
- 3 নং কৃষকের তৃতীয় বছরে কী হয়েছে? সে কি উৎপাদন চালু রাখতে পারবে? উৎপাদন চালু রাখতে তাকে কী করতে হবে?

2. পালমপুরে একটি ক্ষুদ্রায়তন শিল্পের উদাহরণ

বর্তমানে পালমপুরে উৎপাদন শিল্পে 50 জনের কম লোক নিয়োজিত রয়েছে। শহর ও নগরে উৎপাদন শিল্প যেভাবে বৃহদায়তন কারখানায় সংগঠিত হয়, পালমপুরে তেমনভাবে হয় না, এখানে খুব সহজ সরল পদ্ধতিতে ক্ষুদ্র আয়তনে উৎপাদন কার্য হয়। এইসব শিল্পগুলি বাড়িতে বা মাঠে মূলত পারিবারিক

শ্রম দ্বারা পরিচালিত হয়। খুব কম ক্ষেত্রেই বাইরের শ্রমিকের নিয়োগ হয়।

মিশ্রিলাল একটি বিদ্যুৎচালিত আখ মাড়াইযন্ত্র কিনে তার মাঠে বসিয়েছে। আগে বলদ দিয়ে আখ মাড়াই হত, কিন্তু এখন সবাই যন্ত্র দিয়ে তা করতে চাইছে। মিশ্রিলাল নিজেও অন্যের কাছ থেকে আখ কিনে মাড়াই করে তার থেকে গুড় তৈরি করছে। তারপর এইগুলি শাহপুরের ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করছে। এইভাবে মিশ্রিলাল সামান্য মুনাফা অর্জন করছে।

চলো আলোচনা করি

- গুড় উৎপাদন কেন্দ্র স্থাপন করতে মিশ্রিলালের কী ধরনের মূলধন লেগেছে?
- এক্ষেত্রে কে শ্রমের যোগান দিচ্ছে?
- তুমি কি ধারণা করতে পারো, কেন মিশ্রিলাল মুনাফা বৃদ্ধি করতে পারছে না?
- তুমি কি এমন কোনো কারণ ভাবতে পারো, যখন তাঁকে লোকসানের মুখোমুখি হতে হবে?
- মিশ্রিলাল কেন তার তৈরি গুড় নিজের গ্রামে বিক্রি না করে শাহপুরের ব্যবসায়ীদের কাছে বিক্রি করে?

3. পালমপুরের দোকানদাররা

পালমপুরে ব্যাবসার কাজে (পণ্য বিনিময়) বেশি লোক নিয়োজিত নেই। ব্যবসায়ীরা সবাই দোকানদার যারা শহরের পাইকারি বাজার থেকে বিভিন্ন পণ্য ক্রয় করে এবং গ্রামে বিক্রয় করে। তোমরা দেখবে গ্রামে ছোটো সাধারণ দোকান রয়েছে যেখানে বিভিন্ন জিনিস বিক্রি হয় যেমন চাল, গম, চিনি, চাপাতা, তেল, বিস্কুট, সাবান, দাঁতের মাজন, ব্যাটারি, মোমবাতি, খাতা, কলম, পেনসিল এমনকি কিছু কাপড়চোপর। স্বল্প কিছু পরিবার, যাদের বাড়ি বাসস্ট্যান্ডের কাছে তারা সেখানে ছোটো জায়গায় ছোটো দোকান খুলেছে। তারা খাওয়ার জিনিস বিক্রি করে।

করিম গ্রামে একটি কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র খুলেছে। কিছু বছর ধরে একটি বিরাট অংশের ছাত্রছাত্রী শাহপুর শহরের কলেজে পড়তে যাচ্ছে। করিম দেখল যে গ্রামের অনেক ছাত্রছাত্রী শহরে কম্পিউটারের প্রশিক্ষণ নিচ্ছে। গ্রামে দুজন মেয়েরও কম্পিউটার-এর উপর ডিগ্রি রয়েছে। সে তাদের নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সে বাজার লক্ষ করে কম্পিউটার কিনে তার বাড়ির সামনের ঘরে বসিয়েছে। উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীরা ভালো সংখ্যায় সেখানে যোগ দিচ্ছে।

চলো আলোচনা করি

- করিমের মূলধন ও শ্রম কীভাবে মিশ্রিলালের থেকে ভিন্ন ?
- কেন পূর্বে কেউ কম্পিউটার প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন করেনি? সম্ভাব্য কারণগুলি আলোচনা করো।

4. পরিবহণ : একটি দ্রুত উন্নয়নের ক্ষেত্র

পালমপুর থেকে রাইগঞ্জ-এর রাস্তায় বিভিন্ন রকম যানবাহন চলাচল করে। রিকশাওয়ালা, টাঙ্গাওয়ালা, জিপ, ট্র্যাক্টর, ট্রাক চালক, বাসগাড়ির চালক এরা সবাই এই যানবাহন পরিসেবায় রয়েছে। তারা যাত্রী ও মালামাল পরিবহণ করে এবং বিনিময়ে অর্থ পায়। বিগত বেশ কয়েক বছর যাবত পরিবহণ শিল্পে নিয়োজিত লোকের সংখ্যা বাড়ছে।

কিশোর একজন কৃষিশ্রমিক। এরূপ অন্য শ্রমিদের মতো কিশোরও যে মজুরি পায় তা দিয়ে তার পরিবারের প্রয়োজনীয়তা পূরণ করা কঠিন হয়। কয়েক বছর পূর্বে কিশোর ব্যাংক থেকে একটি ঋণ নিয়েছিল। ইহা ছিল একটি সরকারি প্রকল্প যার মাধ্যমে দরিদ্র ভূমিহীন পরিবারগুলিকে সস্তায় ঋণ দেওয়া হয়েছিল। কিশোর ওই ঋণের টাকায় একটি মহিষ ক্রয় করেছিল। সে এখন মহিষের দুধ বিক্রয় করে। উপরন্তু সে একটি দু-চাকার

কাঠের গাড়ি মহিষের সাথে যুক্ত করেছে এবং তা বিভিন্ন মালপত্র পরিবহণে ব্যবহার করছে। সপ্তাহে একবার সে কুমোরের জন্য গঙ্গায় গিয়ে কাদামাটি আনে। অন্য সময় সে গুড় বা অন্য কোনো পণ্য নিয়ে শাহপুর যায়। প্রতিমাসে সে কিছু পরিবহণের কাজ পায়। ফলস্বরূপ সে পূর্বের চেয়ে এখন অনেক বেশি আয় করতে সক্ষম হচ্ছে।

চলো আলোচনা করি

- কিশোরের স্থির মূলধন কত?
- তার কার্যকরী মুলধন হতে পারে বলে তুমি মনে কর?
- কিশোর কত ধরনের উৎপাদন কার্যের সঙ্গে যুক্ত?
- তুমি কি বলতে পারো কিশোর পালমপুরে উন্নত রাস্তা হওয়াতে সে উপকৃত ?

সারাংশ

কৃষি হল গ্রামের প্রধান উৎপাদনশীল কাজ। সময়ের সাথে সাথে কৃষির উৎপাদন পদ্ধতিতে যথেষ্ট পরিবর্তন এসেছে। ফলে একই জমিতে কৃষকদের অধিক ফসল উৎপাদন হচ্ছে। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাপ্তি। যেহেতু জমির পরিমাণ স্থির ও সীমিত। কিন্তু উৎপাদন বৃদ্ধির কারণে জমি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের উপর তার ব্যাপক প্রভাব পড়ছে। নতুন কৃষিপদ্ধতিতে কম জমি ও অধিক মূলধনের প্রয়োজন হয়। মাঝারি ও বড়ো কৃষকরা তাদের উৎপাদন থেকে যে সঞ্চয় করে তা দিয়ে তাদের পরবর্তী মরশুমের মূলধনের ব্যবস্থা করতে পারে। অন্যদিকে ভারতের মোট কৃষকের যেখানে 80% হল ক্ষুদ্র কৃষক, তারা মূলধন সংগ্রহ করতে অসুবিধার সম্মুখীন হয়। তাদের ক্ষুদ্র আয়তনের জমির কারণে উৎপাদন কম হয়। উদ্‌বৃত্ত কম হওয়ায় তারা তাদের নিজস্ব সঞ্চয় হতে মূলধন যোগার করতে পারে না ফলে ঋণ নিতে হয়। ঋণের সাথে সাথে তাদের কৃষিশ্রমিক হিসাবে অন্যের জমিতে অতিরক্ত শ্রম দিতে হয় নিজের ও পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য।

শ্রম হচ্ছে উৎপাদনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপকরণ। এটাই সবচেয়ে আদর্শ হবে যদি কৃষির নতুন প্রযুক্তিতে অধিক শ্রমের ব্যবহার হয়। দুর্ভাগ্যবশত, তা হচ্ছে না। কৃষিতে শ্রমের ব্যবহার সীমিত। তাই মজুরেরা কাজের সন্ধানে প্রতিবেশী গ্রাম, শহর ও নগরগুলিতে অভিবাসী শ্রমিক হিসাবে ছড়িয়ে পড়ছে। কিছু শ্রমিক গ্রামে কৃষি বর্হিভূত ক্ষেত্রে যোগ দিচ্ছে।

বর্তমানে গ্রামে কৃষি বহির্ভূত কাজের ক্ষেত্রটি ততটা বড়ো নয়। গ্রামীণ ভারতে 100 জন শ্রমিকের মধ্যে মাত্র 24 জন কৃষি বহির্ভূত ক্ষেত্রে নিয়োজিত রয়েছে। যদিও গ্রামে কৃষি ব্যতীত বিবিধ কাজ হয়ে থাকে (আমরা কিছু উদাহরণ পালমপুরে দেখেছি); প্রতিটি ক্ষেত্রে খুবই অল্প সংখ্যক লোক নিয়োজিত রয়েছে।

ভবিষ্যতে গ্রামে কৃষি ব্যতীত অন্যান্য কাজ অনেক দেখা যেতে পারে। কৃষির মতো, অকৃষিক্ষেত্রে জমির বেশি প্রয়োজন হয় না। লোকেরা স্বল্প পুঁজি নিয়েই কেউ কৃষি বহির্ভূত ক্রিয়াকলাপ শুরু করতে পারে। কীভাবে একজন এই পুঁজি পাবে? এইজন্য কেউ হয়তো নিজের সঞ্চয় ব্যবহার করতে পারে। কিন্তু প্রায়ই ঋণ নেওয়া হয়। তাই স্বল্প সুদের হারে ঋণের সহজলভ্যতা প্রয়োজন, যাতে করে সঞ্চয়হীন লোকেরাও কৃষিবহির্ভূত ক্রিয়াকলাপ শুরু করতে পারে। কৃষিবহির্ভূত ক্ষেত্রের বিস্তারের জন্য যে বিষয়টি প্রয়োজন তা হল বাজারের উপস্থিতি যেখানে উৎপাদিত পণ্য ও সেবা বিক্রি করা যাবে। পালমপুরের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছিলাম প্রতিবেশী গ্রাম, নগর ও শহরগুলির বাজারে দুধ, গুড়, গম ইত্যাদি বিক্রির সুবিধা ছিল। গ্রামগুলি যত বেশি ভালো রাস্তাঘাট, পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার দ্বারা পার্শ্ববর্তী নগর ও শহরের সাথে যুক্ত হবে ততই আগামী বছরগুলিতে কৃষি বহির্ভূত ক্ষেত্রের সুযোগ বৃদ্ধি পাবে।

অনুশীলনী

1. প্রতি দশ বছর অন্তর ভারতের প্রতি গ্রামে জনগণনার সময় জরিপ করা হয় এবং এর কিছু নমুনা নীচে দেওয়া হল। পালমপুরের তথ্যের উপর ভিত্তি করে তা পূরণ করো।

   a. অবস্থান

   b. গ্রামের মোট এলাকা

   c. ব্যবহৃত জমি (প্রতি হেক্টরে)

কর্ষিত জমি		অকর্ষিত জমি (জনবসতি, রাস্তা, পুকুর, চারণভূমি)
সেচযুক্ত	সেচহীন	
		26 হেক্টর

   d. সুযোগসুবিধা ঃ

শিক্ষাগত	
বাজার	
বিদ্যুৎ সরবরাহ	
স্বাস্থ্য	
যোগাযোগ	
নিকটবর্তী শহর	

2. আধুনিক কৃষি পদ্ধতিতে প্রচুর উপকরণ প্রয়োজন যা কলকারখানায় তৈরি হয়। তুমি কি তা স্বীকার কর?
3. কীভাবে বিদ্যুতের বিস্তার পালমপুরের চাষিদের উপকৃত করেছে?
4. জলসেচের আওতায় কি জমির পরিমাণ বৃদ্ধির প্রয়োজন? কেন?
5. পালমপুরের 450 পরিবারে যেভাবে জমি বণ্টন হয়েছে তার একটা সারণি তৈরি করো।
6. কৃষিশ্রমিকদের মজুরি কেন পালমপুরে ন্যূনতম মজুরির চেয়ে কম?
7. তোমার এলাকায় দুইজন শ্রমিকের সাথে কথা বলো। হয় কৃষিশ্রমিক বা নির্মাণশ্রমিক নির্বাচন করো। তারা কি মজুরি পায়? তাদের কি নগদে বা অন্যভাবে মজুরি প্রদান করা হয়? তারা কি নিয়মিত কাজ পায়? তারা কি ঋণগ্রস্ত?
8. একই পরিমাণ জমিতে কীভাবে বিভিন্ন উপায়ে উৎপাদন বৃদ্ধি করা যায়? উদাহরণ সহ ব্যাখ্যা করো।
9. 1 হেক্টর জমিতে একজন কৃষকের কার্যকলাপ বর্ণনা করো।
10. কীভাবে কৃষিকাজ থেকে মাঝারি ও বড়ো কৃষকরা পুঁজি সংগ্রহ করে? তা কীভাবে ছোটো কৃষক থেকে ভিন্ন?
11. কী কী শর্তে সবিতা তেজপাল সিং এর কাছ থেকে ঋণ পেয়েছিল? যদি সে ব্যাংক থেকে কম সুদে ঋণ পেত তাহলে তার অবস্থায় কী পার্থক্য হত?

12. তোমার এলাকার কিছু প্রবীণ নাগরিকের সাথে কথা বলো এবং গত 30 বছরে সেচব্যবস্থা ও উৎপাদন পদ্ধতিতে কি পরিবর্তন হয়েছে তার একটি বিবরণী প্রস্তুত করো।
13. তোমার এলাকায় কী কী কৃষিবহির্ভূত কার্যকলাপ সংগঠিত হয়? এর একটি সংক্ষিপ্ত তালিকা তৈরি করো।
14. গ্রামে যাতে কৃষিবহির্ভূত উৎপাদন কার্য আরও বেশি করে শুরু করা যায় তার জন্য কী কী করা যেতে পারে?

References

ETIENNE, GILBERT. 1985. *Rural Development in Asia*: *Meetings with Peasants*, Sage Publications, New Delhi.

ETIENNE, GILBERT. 1988. *Food and Poverty: India's Half Won Battle*, Sage Publications, New Delhi.

RAJ, K.N. 1991. 'Village India and its Political Economy' in C.T. Kurien (Edited) *Economy, Society and Development*, Sage Publications, New Delhi

THORNER, DANIEL AND ALICE THORNER. 1962. *Land and Labour in India*, Asia Publishing House, Bombay.

http://economictimes.indiatimes.com/news/policy/government-hikes-minimumwage-for-agriculture-labourer/articleshow/57408252.cms

২
অধ্যায়

সম্পদ হিসাবে মানুষ
(People as Resource)

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

'সম্পদ হিসাবে মানুষ' এই অধ্যায়টিতে জনসংখ্যা অর্থনীতির বোঝা নয় বরং সম্পদ এ নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করা হয়েছে। যখন শিক্ষা, প্রশিক্ষণ এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষায় বিনিয়োগ করা হয় তখন জনসংখ্যা মানব সম্পদে পরিণত হয়। বস্তুত, মানব সম্পদ হচ্ছে তাদের মধ্যে প্রকাশিত দক্ষতা এবং উৎপাদনশীল জ্ঞানের সম্ভার।

যাদের মধ্যে উৎপাদন দক্ষতা ও সামর্থ্য আছে তাদেরকে দেশের কর্মক্ষম লোক (working people) হিসাবে গণ্য করার একটি পথ হচ্ছে 'সম্পদ হিসেবে মানুষ'। জনসংখ্যার উৎপাদনশীলতার দৃষ্টিকোণ থেকে মোট জাতীয় উৎপাদনে (Gross National Product) তার অবদান সম্পর্কে ধারণা করা যায়। অন্যান্য সম্পদের মতো জনগণও হচ্ছে একটি সম্পদ --- 'মানব সম্পদ'। এটা হচ্ছে বিশাল জনসংখ্যার একটি ইতিবাচক দিক যা প্রায়শই উপেক্ষা করা হয়। যখন আমরা নেতিবাচক দিক দেখি তখন জনগণের খাদ্যের সমস্যা, শিক্ষার সমস্যা এবং স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সমস্যাগুলি নিয়ে বিবেচনা করি। অধিক শিক্ষিত ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী করার জন্য বর্তমান মানব সম্পদকে যখন আরও উন্নত করা হয় তখন তাকে আমরা 'মানব মূলধন গঠন' (Human capital formation) বলি যা দেশে উৎপাদন শক্তিকে বাড়াতে সাহায্য করে ঠিক বস্তুগত মূলধন গঠন (Physical capital formation)-এর মতো।

মানব মূলধনে অধিক বিনিয়োগ (শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য সুরক্ষার মাধ্যমে) করলে বস্তুগত মূলধনের মতোই প্রতিদান পাওয়া যায়। অধিক শিক্ষিত অথবা উন্নত প্রশিক্ষিত এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী জনগণের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ার ফলে তাদের উপার্জিত আয়ের পরিমাণও বাড়তে থাকে।

ভারতের সবুজ বিপ্লব হল একটি নাটকীয় (dramatic) উদাহরণ যা থেকে বোঝা যায় কীভাবে উন্নত উৎপাদন প্রযুক্তির প্রয়োগে উন্নত জ্ঞানের ব্যবহার দ্বারা অপ্রচলিত ভূমি সম্পদগুলির উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি করা যেতে পারে। কীভাবে মানব মূলধন বস্তু, শিল্প ও কলকারখানার উপরেও তার অবস্থান নিশ্চিত করেছে, ভারতের তথ্যপ্রযুক্তির অভাবনীয় উন্নতি তার একটি উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

উৎস : পরিকল্পনা কমিশন, ভারত সরকার।

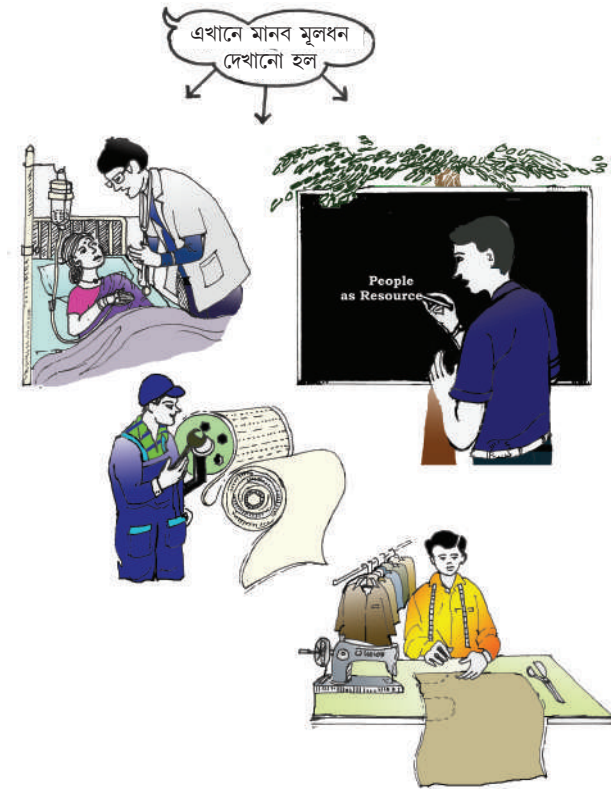

চিত্র 2.1

চলো আলোচনা করি

- উপরের ছবির দিকে তাকিয়ে তোমরা কি বলতে পারো কীভাবে একজন ডাক্তার, শিক্ষক, ইঞ্জিনিয়ার এবং দর্জিকে অর্থনীতিতে সম্পদ হিসাবে গণ্য করা হয়?

অধিক শিক্ষিত এবং স্বাস্থ্যবান ব্যক্তিরা শুধুমাত্র উচ্চতর আয় থেকে লাভ করে না, সমাজও তাদের থেকে অপ্রত্যক্ষ উপায়ে লাভ করে। অধিক শিক্ষিত বা স্বাস্থ্যবান জনগোষ্ঠীর সুফল অন্য যারা নিজেরা শিক্ষিত নন বা উপযুক্ত স্বাস্থ্যসেবা পান না তাদেরকেও স্পর্শ করে। প্রকৃতপক্ষে মানব মূলধন অন্যান্য সম্পদ যেমন জমি ও বস্তুগত মূলধন থেকে উন্নততর। মানব সম্পদ জমি ও মূলধন ব্যবহার করতে পারে। জমি এবং মূলধনের কোনো নিজস্বতা নেই।

কয়েক দশক ধরে ভারতবর্ষে বিশাল জনসংখ্যাকে সম্পদ না ভেবে বোঝা বা দায় (liability) বলে মনে করা হত। কিন্তু বিশাল জনসংখ্যা দায় বা বোঝা নয়। মানব মূলধনে বিনিয়োগ করে একে উৎপাদনশীল সম্পদে পরিণত করা যায়। (উদাহরণস্বরূপ, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে ব্যয় বৃদ্ধি করে, আধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য শিল্প ও কৃষিশ্রমিকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে ব্যবহার করে ইত্যাদি)

কীভাবে জনগণ নিজেকে আরও উৎপাদনশীল সম্পদে পরিণত করার জন্য চেষ্টা করে তা নীচের দুটি ঘটনা বাক্সে আলোচনা করা হল।

সাকালের গল্প

সেমাপুর গ্রামে বিলাস এবং সাকাল নামে দুজন বন্ধু বাস করত। সাকালের বয়স ছিল বারো বছর। তার মা শীলা গৃহস্থালির কাজকর্ম দেখাশোনা করত। তার বাবা বুটা চৌধুরী কৃষিক্ষেত্রে কাজ করত। সাকাল তার মাকে গৃহস্থালির কাজে সাহায্য করত। সে তার ছোটো ভাই জিতু এবং বোন সীতুকে দেখাশোনাও করত। তার কাকা শ্যাম মাধ্যমিক পাশ করেছিল কিন্তু বাড়িতে অলসের মতো বসে থাকে যেহেতু তার কোনো চাকুরি নেই। বুটা এবং শীলা সাকালকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য উৎসাহী ছিলেন। তাঁরা তাকে গ্রামের স্কুলে ভরতি হওয়ার জন্য চাপ দিয়েছিলেন এবং সেখানে সে ভরতি হয়েছিল। সে পড়াশোনা শুরু করেছিল এবং সে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছিল। তার বাবা তাকে পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য উৎসাহ দিয়েছিল। তার বাবা সাকালকে কম্পিউটারে বৃত্তিমূলক শিক্ষা দেওয়ার জন্য ঋণ নিয়েছিল। সাকাল ছিল মেধাবী এবং প্রথম থেকেই পড়াশোনার প্রতি আগ্রহী ছিল। মহা উৎসাহ এবং উদ্দীপনার সহিত সে তার পাঠ সম্পূর্ণ করল। কিছুদিন পর সে বেসরকারি ক্ষেত্রে চাকরি পেয়েছিল। সে এমনকি একটি নতুন ধরনের সফটওয়্যার ডিজাইন (Software designed) করেছিল। এই সফটওয়্যার ফার্মের বিক্রি বৃদ্ধি করতে সাহায্য করেছিল। তার উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ তার পরিসেবার জন্য কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন এবং পুরস্কারস্বরূপ তাকে উচ্চতর পদে উন্নীত করেছিলেন।

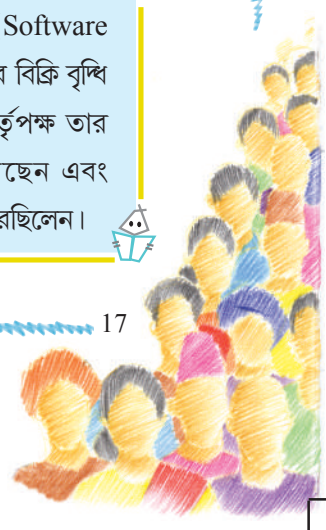

চিত্র 2.2 *বিলাস ও সাকালের গল্প*

বিলাসের গল্প

এগারো বছরের বিলাস সাকালের মতো একই গ্রামে বাস করে। বিলাসের বাবা মহেশ হলেন একজন জেলে। যখন তার বয়স দুই বছর তখন তার বাবা মারা গিয়েছিলেন। তার মা গীতা পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য মাছ বিক্রি করে অর্থ উপার্জন করত। সে জমির মালিকের পুকুর থেকে মাছ কিনত এবং নিকটবর্তী হাটে বিক্রি করত। মাছ বিক্রি করে সে দিনে মাত্র 20-30 টাকা উপার্জন করত। বিলাস আর্থরাইটিসের (Arthritis) রোগী ছিল। তার মার তাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাওয়ার মতো সামর্থ্য ছিল না। সে এমনকি স্কুলেও যেতে পারত না। সে পড়াশোনায় আগ্রহী ছিল না। সে তার মাকে রান্নার কাজে সাহায্য করত এবং তার ছোটো ভাই মোহনের দেখাশোনা করত। কিছুদিন পর তার মা অসুস্থ হয়ে পড়েছিল এবং তাকে দেখাশোনা করার জন্য কেউ ছিল না। তাদের সাহায্য করার জন্য পরিবারের কেউ ছিল না। বিলাসও একই গ্রামে মাছ বিক্রি করতে বাধ্য হয়েছিল। সে তার মায়ের মতোই অল্প অর্থ উপার্জন করত।

চলো আলোচনা করি

- তোমরা কি দুই বন্ধুর মধ্যে কোনো পার্থক্য দেখতে পেয়েছ? ওইগুলি কী?

কার্যক্রম

কাছাকাছি কোনো গ্রাম বা বস্তি এলাকা পরিদর্শন করো এবং তোমাদের বয়সি কোনো ছেলে অথবা মেয়েকে নিয়ে একটি প্রকল্প লেখো, যাদের অবস্থা বিলাস ও সাকলের মতো।

দুটো ঘটনা পর্যবেক্ষণ করে আমরা দেখেছিলাম যে সাকাল বিদ্যালয়ে গিয়েছিল এবং বিলাস যায় নি। সাকাল শারীরিকভাবে সুস্থ এবং সবল ছিল। বার বার তাকে ডাক্তারের কাছে যেতে হত না। বিলাস ছিল আর্থাইটিসের (Arthritis) রোগী। তার ডাক্তার দেখানোর মতো সামর্থ্য ছিল না, সাকাল কম্পিউটারের ডিগ্রি অর্জন করেছিল। সাকাল বেসরকারি ফার্মে চাকরি পেয়েছিল যেখানে বিলাস তার মায়ের মতো একই কাজ চালিয়ে গিয়েছিল, পরিবারকে সাহায্য করার জন্য। সে তার মায়ের মতোই অল্প অর্থ উপার্জন করত।

সাকালের ক্ষেত্রে অনেক বছরের শিক্ষা তার শ্রমের দক্ষতাকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। এটা তার মোট উৎপাদনশীলতাকে বৃদ্ধি করে দিয়েছিল। মোট উৎপাদনশীলতা অর্থনীতির বিকাশকে বৃদ্ধি করে।

এর পরিবর্তে একজন ব্যক্তিকে বেতন বা তার পছন্দমতো অন্য কোনো রূপে পুরস্কৃত করা হয়। বিলাস তার জীবনের প্রথম ভাগে কোনো শিক্ষা বা স্বাস্থ্যসেবা পায়নি। সে তার মায়ের মতো মাছ বিক্রি করে জীবনযাপন করত। এর ফলে সে তার মায়ের মতো অদক্ষ শ্রমিকের বেতন পেত।

মানব সম্পদে বিনিয়োগ (শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা ক্ষেত্রে) করলে ভবিষ্যতে উচ্চ প্রতিদানের ফল পাওয়া যায়। ব্যক্তির উপর এই বিনিয়োগ জমি এবং মূলধনের উপর বিনিয়োগের মতোই। ভবিষ্যতে উচ্চ প্রতিদান পাওয়ার আশায় একজন শেয়ার ও বন্ডে বিনিয়োগ করে।

একজন শিশুর ক্ষেত্রেও শিক্ষা ও স্বাস্থ্যে বিনিয়োগ করা হলে, ভবিষ্যতে উচ্চ আয় করতে পারবে এবং সমাজে অধিক প্রতিদান দিতে পারবে। এটা দেখা যায় যে, শিক্ষিত পিতা-মাতা তাঁদের সন্তানদের শিক্ষাখাতে প্রচুর বিনিয়োগ করে। এর কারণ হল তাঁরা নিজেরা শিক্ষার গুরুত্ব বুঝতে পারে। তাঁরা সঠিক পুষ্টিবিধান (Nutrition) এবং স্বচ্ছতা (Hygiene) বিষয়েও সচেতন। এইভাবে তাঁরা নিজেদের শিশুদের বিদ্যালয়ের শিক্ষা এবং ভালো স্বাস্থ্যের প্রয়োজনীয়তার অনুভব করে। এইভাবে এইক্ষেত্রে একটি সদ্‌গুণসম্পন্ন চক্র (Virtuous cycle) সৃষ্টি হয়েছে। বিপরীতপক্ষে, অশিক্ষিত ও অস্বচ্ছতার জন্য বঞ্চিত পিতা-মাতা একটি দুষ্ট চক্র (Vicious circle) সৃষ্টি করতে পারে এবং তাঁদের সন্তানদেরও একইরকম অসুবিধাজনক স্থিতি (disadvantaged state) সৃষ্টি করতে পারে।

জাপানের মতো দেশ মানব সম্পদে বিনিয়োগ করে। তাদের কোনো প্রাকৃতিক সম্পদ নেই। এই দেশগুলি হল উন্নত/ধনী দেশ। তারা তাদের দেশের জন্য প্রয়োজনীয় প্রাকৃতিক সম্পদ আমদানি করে। তারা কীভাবে ধনী/উন্নত হল? তারা জনগণের জন্য বিশেষ করে শিক্ষা ও স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিনিয়োগ করেছে। এই সমস্ত জনগণ অন্যান্য সম্পদ যেমন- জমি এবং মূলধনের দক্ষ ব্যবহার করেছে। জনগণের দ্বারা বিকশিত দক্ষতা এবং প্রযুক্তি এই দেশগুলিকে ধনী/উন্নত করে তুলেছে।

পুরুষ এবং মহিলাদের দ্বারা অর্থনৈতিক কার্যাবলি ঃ-

বিলাস এবং সাকালের মতো লোকেরা বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপে যুক্ত। আমরা দেখেছি যে বিলাস মাছ বিক্রি করত এবং সাকাল একটি ফার্মে চাকরি পেয়েছিল। বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপকে তিনটি প্রধান ক্ষেত্রে ভাগ করা হয়েছে। যেমন : প্রাথমিক (Primary), মাধ্যমিক (Secondary) এবং সেবাক্ষেত্র (Tertiary)। প্রাথমিকক্ষেত্র যার মধ্যে কৃষিকার্য, বনজ সম্পদ আহরণ, পশুপালন, মৎস্যচাষ, মুরগি পালন, খনি এবং খনন কার্য। নির্মাণ শিল্প মাধ্যমিক ক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। ব্যবসা, পরিবহণ, যোগাযোগ ব্যবস্থা, ব্যাংকিং, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পর্যটন, চাকরি, বিমা ইত্যাদি সেবাক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত। এই ক্ষেত্রের কার্যকলাপের জন্য দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন হয়। এই কার্যাবলিগুলি জাতীয় আয় বৃদ্ধি করে। এই কার্যাবলিগুলিকে অর্থনৈতিক কার্যাবলি বলে। অর্থনৈতিক কার্যাবলিগুলিকে আবার দুইভাবে ভাগ করা হয়েছে — বাজার সংক্রান্ত কার্যাবলি (Market activities) এবং অবাজার সংক্রান্ত কার্যাবলি (Non-market activities)। বেতন বা লাভের উদ্দেশ্যে যে কাজ করে তার পারিশ্রমিক বাজার কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত। এইগুলির মধ্যে দ্রব্য ও সেবা উৎপাদন অন্তর্ভুক্ত যার মধ্যে সরকারি সেবাও বর্তমান। বাজার বহির্ভূত কার্যাবলি হল

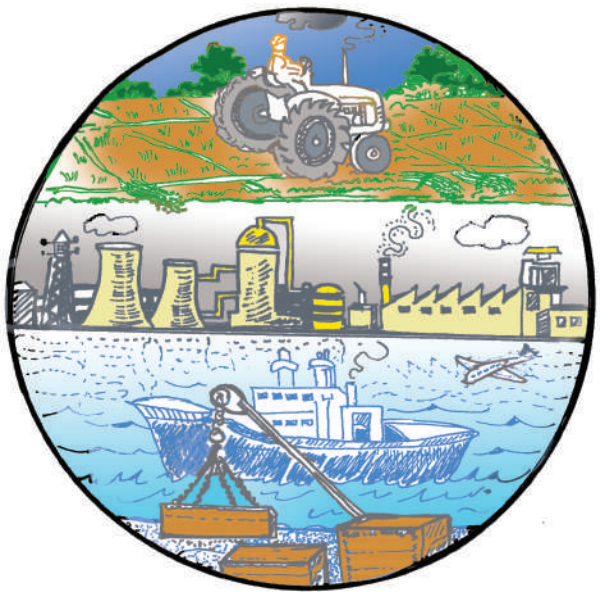

চিত্র 2.3 *এই চিত্রটিকে ভিত্তি করে তুমি কি অর্থনৈতিক কার্যকলাপগুলিকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করতে পারো?*

নিজস্ব ভোগের জন্য উৎপাদন। এর মধ্যে প্রাথমিক দ্রব্যের ভোগ এবং প্রক্রিয়াকরণ তথা নিজের স্থায়ী সম্পত্তির অংশ হিসেবে উৎপাদিত হয়।

কার্যকলাপ

তোমার আবাসিক এলাকায় একটি গ্রাম বা কলোনি পরিদর্শন করো এবং ওই গ্রামের বা কলোনির লোকেদের বিভিন্ন কার্যাবলি লিপিবদ্ধ করো।

যদি এটা সম্ভব না হয় তাহলে তোমার প্রতিবেশীকে জিজ্ঞাসা করো তাদের পেশা কী? তাদের কাজগুলিকে তুমি তিনটি ক্ষেত্রের মধ্যে কোন্ ক্ষেত্রে অন্তর্ভুক্ত করতে পারো?

বল এই কাজগুলি কী অর্থনৈতিক, না অ-অর্থনৈতিক কাজ। বিলাস গ্রামের বাজারে মাছ বিক্রি করে। বিলাস তার পরিবারের জন্য রান্না করে। সাকাল বেসরকারি ফার্মে কাজ করে, সাকাল তার ছোটো ভাইবোনদের দেখাশোনা করে।

ঐতিহাসিক এবং সাংস্কৃতিক কারণে পরিবারে মহিলা এবং পুরুষের মধ্যে শ্রমবিভাগ হয়েছে। মহিলারা সাধারণত বাড়িঘরের ছোটোখাটো কাজকর্ম দেখাশোনা করে এবং পুরুষরা মাঠে কাজ করে। সাকালের মা শীলা খাবার রান্না করে, বাসনপত্র পরিষ্কার করে, কাপড় ধোওয়ার কাজ করে, বাড়িঘর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে এবং তার ছেলেমেয়েদের দেখাশোনা করে। সাকালের বাবা বুটা মাঠে চাষ করে, বাজারে উৎপাদিত ফসল বিক্রি করে এবং পরিবারের জন্য টাকা উপার্জন করে।

শীলা তার পরিবার প্রতিপালন করার জন্য যে সেবাদান করে তার জন্য তাকে কোনো অর্থ দেওয়া হয় না। বুটা অর্থ উপার্জন করে যা সে পরিবারের ভরণ-পোষণের জন্য খরচ করে। মহিলা যে গৃহস্থালি কাজকর্ম করে তা জাতীয় আয়ের অন্তর্ভুক্ত হয় না।

গীতা, বিলাসের মা, মাছ বিক্রি করে আয় উপার্জন করে। সুতরাং মহিলারা যখন শ্রমের বাজারে প্রবেশ করে তখন তাদেরকে তাদের কাজের জন্য মজুরি দেওয়া হয়। তাদের আয় তাদের পুরুষ সহযোগীদের মতো শিক্ষা ও দক্ষতার দ্বারা নির্ধারিত হয়। শিক্ষা ব্যক্তিকে অর্থনৈতিক সুযোগসুবিধাগুলিকে ভালোভাবে ব্যবহার করতে সাহায্য করে। শিক্ষা এবং দক্ষতা হচ্ছে বাজারে কোনো ব্যক্তির আয়ের প্রধান নির্ধারক। অধিকাংশ মহিলারা অল্প শিক্ষা এবং নিম্ন দক্ষতা সম্পন্ন হয়। পুরুষদের তুলনায় মহিলাদের কম পারিশ্রমিক দেওয়া হয়। অধিকাংশ মহিলারা সেখানে চাকুরি করে বা কাজ করে যেখানে চাকুরি বা কাজের কোনো সুরক্ষা নাই তথা আইনি সুরক্ষা খুবই কম। অনিয়মিত রোজগার এবং কম আয় এইক্ষেত্রের বিশেষতা। এই ক্ষেত্রে, মাতৃত্বকালীন ছুটি, শিশুর যত্ন এবং অন্যান্য সামাজিক সুরক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় সুযোগ সুবিধা পাওয়া যায় না। তথাপি, উচ্চশিক্ষা এবং উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন মহিলাদেরকে পুরুষদের মতো পারিশ্রমিক/বেতন দেওয়া হয়, সংগঠিত ক্ষেত্রে শিক্ষণ এবং চিকিৎসা তাদেরকে সবচেয়ে বেশি আকর্ষিত করে। কিছু মহিলারা প্রশাসনিক এবং অন্যান্য পরিসেবায় প্রবেশ করে, যার মধ্যে চাকুরিও অন্তর্ভুক্ত, যার জন্য বৈজ্ঞানিক এবং প্রযুক্তিগত যোগ্যতার উচ্চ স্তরের প্রয়োজন হয়। তোমার বোন বা সহপাঠীকে জিজ্ঞেস কর সে কী হতে চায়?

জনসংখ্যার গুণাবলি

জনসংখ্যার গুণগত মান সাক্ষরতার হার, গড় আয়ু দ্বারা নির্দেশিত, ব্যক্তি স্বাস্থ্য এবং দেশের মানুষের দ্বারা অর্জিত দক্ষতা গঠনের উপর নির্ভর করে। অবশেষে জনসংখ্যার গুণগত মান দেশের বিকাশের হার নির্ধারণ করে। অশিক্ষিত ও দুর্বল স্বাস্থ্যের জনগণ অর্থনীতির বোঝা বা দায়। শিক্ষিত এবং সুস্থ জনগণ অর্থনীতির সম্পদ।

শিক্ষা

সাকালের জীবনের প্রাথমিক বছরগুলির শিক্ষা একটি ভালো চাকুরি এবং বেতনের রূপে পরবর্তী বছরগুলিতে ফল দেয়। আমরা দেখলাম যে সাকালের বিকাশের জন্য শিক্ষা হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এটি তার জন্য নতুন দিগন্ত খুলেছে, নতুন আকাঙ্ক্ষার সৃষ্টি করেছে এবং জীবনের মূল্য বিকশিত করেছে। শুধুমাত্র সাকালের জন্য নয়, সমাজের বিকাশের জন্যও শিক্ষার অবদান

চিত্র 2.4 : *বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী*

রয়েছে। এটি জাতীয় আয়, সাংস্কৃতিক সমৃদ্ধিকে বাড়ায় এবং প্রশাসনের কার্য ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। মেয়েদের উপর বিশেষ জোর দিয়ে, শিক্ষার সর্বজনীন গ্রহণযোগ্যতা, রক্ষণ এবং গুণগত

... ব্যক্তি হল একটি ইতিবাচক সম্পত্তি এবং একটি মূল্যবান জাতীয় সম্পদ, যাকে আশা উদ্দীপনা ও যত্নের সহিত সুন্দরভাবে লালনপালন এবং উন্নতিবিধান করা প্রয়োজন। প্রত্যেক ব্যক্তির বিকাশের সমস্যা এবং প্রয়োজনীয়তা বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। এই জটিল এবং গতিশীল বিকাশ প্রক্রিয়ায় অনুঘটক হিসাবে শিক্ষার সদর্থক পরিকল্পনা রূপায়ণ করা এবং খুব সংবেদনশীলতার সাথে কার্যকর করা প্রয়োজন।

উৎস :- জাতীয় শিক্ষানীতি, 1986

লেখচিত্র 2.1 :- ভারতের সাক্ষরতার হার

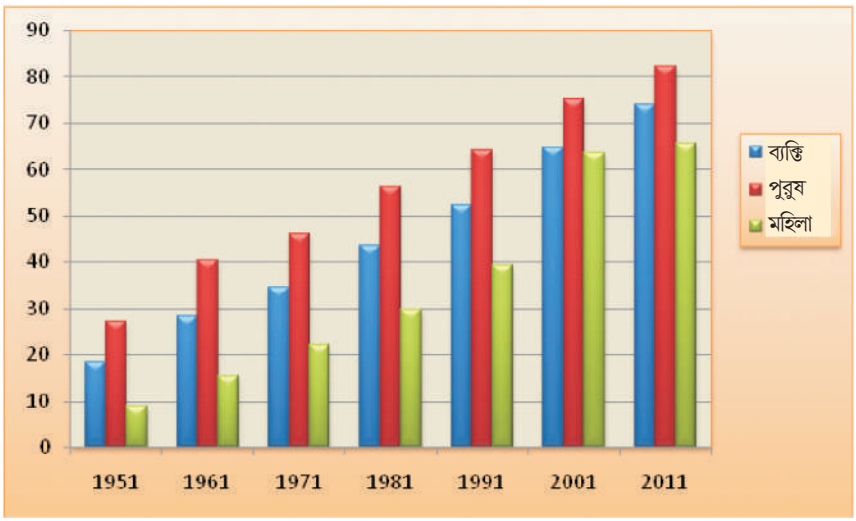

উৎস: Envis Centre on Population; Economy Survey, 2015-16.
(http://iipsenvis.nic.in/database/population4087.aspx)

মান প্রদানের জন্য একটি ব্যবস্থা আছে। প্রত্যেক জেলাতে নবোদয় বিদ্যালয়ের মতো বিদ্যালয় স্থাপন করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। বিশাল সংখ্যক উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের জ্ঞান ও দক্ষতার মাধ্যমে পেশা নির্ধারণ করার জন্য বৃত্তিমূলক শাখার উন্নতি করা হয়েছে। শিক্ষাখাতে পরিকল্পিত ব্যয় প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে ছিল 151 কোটি টাকা যা একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাতে বেড়ে 3766.90 কোটি টাকা হয়েছে। GDP তে শিক্ষাখাতে ব্যয় 1951-52 সালে ছিল 0.64% যা 2015-16 সালে বেড়ে হয়েছে 3.0% এবং বিগত কয়েক বছর ধরে 3%-এ স্থির রয়েছে। সাক্ষরতার হার 1951 সালে 18% থেকে বেড়ে

চলো আলোচনা করি

উপরের লেখচিত্রটি পর্যবেক্ষণ করো এবং নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :-

1. 1951 সাল থেকে জনসংখ্যার সাক্ষরতার হার কি বেড়েছে?
2. ভারতের সাক্ষরতার হার কোন্ বছর সবচেয়ে বেশি?
3. ভারতবর্ষে পুরুষদের মধ্যে সাক্ষরতার হার বেশি কেন?
4. মহিলারা পুরুষদের তুলনায় কম শিক্ষিত কেন?
5. ভারতবর্ষের সাক্ষরতার হার তুমি কীভাবে পরিমাপ করবে?
6. 2020 সালে ভারতের সাক্ষরতা হার সম্পর্কে তোমার কী অনুমান হতে পারে?

কার্যকলাপ

তোমার বিদ্যালয়ে অথবা তোমার প্রতিবেশী কোনো বিদ্যালয়ের ছেলে ও মেয়েদের সংখ্যা গণনা করো।

বিদ্যালয় প্রশাসনকে বলো যাতে শ্রেণিকক্ষের ছেলে এবং মেয়েদের সংখ্যা জানায়। যদি কোনো পার্থক্য থাকে, তাহলে সেটা অবলোকন করো এবং শ্রেণিকক্ষে তার কারণ ব্যাখ্যা করো।

2010-11 সালে 74% হয়েছে। সাক্ষরতা শুধুমাত্র অধিকার নয়, নাগরিকরা তাদের দায়িত্ব পালন এবং অধিকারগুলি সঠিকভাবে ভোগ করে কি না তাও দেখা প্রয়োজন। যদিও জনসংখ্যার বিভিন্ন বিভাগে একটি বিশাল পার্থক্য দেখা যায়। পুরুষদের মধ্যে সাক্ষরতার হার মহিলাদের চেয়ে 16.6% বেশি এবং গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলে প্রায় 16.1% বেশি। 2011 সালে কেরালায় সাক্ষরতার হার ছিল 94% যেখানে বিহারে ছিল 62%। 2004-05 সালে প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থা 7.68 লক্ষ পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে। দুর্ভাগ্যবশত, বিদ্যালয়ে নীচু মানের শিক্ষাদান এবং উচ্চহারে বিদ্যালয়ছুট (ড্রপ আউট)-এর জন্য বিদ্যালয়গুলির এই বিশাল সম্প্রসারণকেও কার্যত ব্যর্থতায় পরিণত করেছে। সর্বশিক্ষা অভিযান (SSA) 2010 সালের ছয় থেকে চোদ্দো বছর বয়সের শিশুদের সবাইকে প্রাথমিক শিক্ষা প্রদানের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এটি প্রাথমিক শিক্ষার সর্বজনীনতা অর্জনের লক্ষ্যে রাজ্য সরকার, স্থানীয় সরকার ও বিভিন্ন সংগঠনের সাথে অংশীদারিত্বের একটি সময় নির্ধারিত কেন্দ্রীয় উদ্যোগ। এটির সাথে সাথে প্রাথমিক শিক্ষায় ভরতি বাড়াতে ব্রিজ কোর্সেস (bridge courses) এবং বিদ্যালয় চলো (Back-to-school) শিবিরের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। শিশুদের উপস্থিতি বাড়াতে এবং শিশুদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য এবং তাদের পুষ্টির অবস্থার উন্নতির জন্য মিড-ডে-মিল পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা হয়েছে। এই নীতিগুলি ভারতের শিক্ষিত জনসংখ্যাকে বাড়াতে পারে।

দ্বাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় 18-23 বয়সিদের উচ্চশিক্ষায় মোট নথিভুক্ত অনুপাত (Gross Enrollment Ratio) 2017-18 সালের হিসাবে 25.2% এবং 2020-21 সালের হিসাবে 30% লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছে দেওয়ার প্রচেষ্টা করেছে যা বিশ্ব গড়ের (World average) সাথে একই পঙ্‌ক্তিতে অবস্থিত। এই কৌশল দক্ষতা বৃদ্ধি, গুণগতমান, রাজ্যভিত্তিক পাঠ্যসূচির পরিবর্তন, বৃত্তিমূলক শিক্ষাকরণ এবং তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহারের জন্য ভালো বিস্তার করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। এই পরিকল্পনাটি দূরবর্তী শিক্ষা, প্রচলিত, অপ্রচলিত, দূরবর্তী এবং তথ্য প্রযুক্তি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে একত্রিত করার উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। গত পঞ্চাশ বছর ধরে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা ও বিশেষ অঞ্চলে উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। 1951 সাল থেকে 2014-15 সাল পর্যন্ত কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, ছাত্রছাত্রীদের সংখ্যাবৃদ্ধি এবং শিক্ষকদের নিয়োগের সংখ্যা দেখতে চলো আমরা সারণিটি পড়ি।

সারণি 2.1 : উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ভরতি এবং শিক্ষক-শিক্ষিকার সংখ্যা

বছর	মহাবিদ্যালয়ের সংখ্যা	বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা	ছাত্রছাত্রী	বিশ্ববিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক সংখ্যা
1950–51	750	30	2,63,000	24,000
1990–91	7,346	177	49,25,000	2,72,000
1998–99	11,089	238	74,17,000	3,42,000
2010–11	33,023	523	186,70,050	8,16,966
2012–13	37,204	628	223,02,938	9,25,396
2014–15	40,760	711	265,85,437	12,61,350
2015-16	41,435	753	284,84,741	14,38,000

উৎস : UGC এর বার্ষিক রিপোর্ট 2010-11, 2012-13, 2013-14 এবং নির্বাচিত শিক্ষাগত পরিসংখ্যান, মানব সম্পদ উন্নয়ন দপ্তর।

চলো আলোচনা করি

শ্রেণিকক্ষে এই সারণিটি নিয়ে আলোচনা করো এবং নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও ।

1. কলেজের সংখ্যা বৃদ্ধি কি ক্রমবর্ধমান ছাত্রছাত্রীদের ভরতির জন্য যথেষ্ট?
2. তুমি কি মনে কর যে আমাদের আরও বিশ্ববিদ্যালয় থাকা উচিত?
3. 1998-99 সালে শিক্ষকদের মধ্যে কী ধরনের উন্নতি লক্ষ করা গেছে?
4. ভবিষ্যতে কলেজগুলি ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলি সম্পর্কে তোমার ধারণা কী?

স্বাস্থ্য

ফার্ম মুনাফা সর্বাধিক করে : তুমি কি মনে কর যে কোনো ফার্মকে এমন লোকদের নিয়োগ করতে অনুপ্রাণিত করা হবে যারা অসুস্থ স্বাস্থ্যের জন্য সুস্থ শ্রমিকের মতো দক্ষতার সাথে কাজ করতে পারে না? একজন ব্যক্তির স্বাস্থ্য তার ক্ষমতা এবং অসুস্থতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সামর্থ্যকে বোঝাতে সাহায্য করে।

চিত্র 2.5 :- *স্বাস্থ্য পরীক্ষা করার জন্য শিশুরা সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে।*

একজন অসুস্থ ব্যক্তি প্রকৃতপক্ষে একটি সংস্থার বোঝা বা দায় হয়ে দাঁড়ায়; ভালো ব্যক্তিদের অনুসরণ করার জন্য স্বাস্থ্য একটি অপরিহার্য ভিত্তি। এই কারণে, দেশে জনগণের স্বাস্থ্য অবস্থার উন্নতিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে। অপরের অপেক্ষা কম সুবিধাপ্রাপ্ত জনগণের উপর বিশেষ নজরের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা, পরিবার কল্যাণ ও পুষ্টির সেবার উন্নতি আমাদের জাতীয় নীতিরও লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য। গত পাঁচ দশক ধরে ভারত একটি বিশাল স্বাস্থ্য পরিকাঠামো গড়ে তুলেছে এবং সরকারের পাশাপাশি বেসরকারি খাতে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও সেবাক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় মানবশক্তি উন্নত করেছে।

এই গৃহীত পদক্ষেপ 2013 সালে গড় আয়ু 67.5 বছর হয়েছে। *শিশু মৃত্যু হার (Infant Mortality Rate) 1951 সালে ছিল 147 যা 2013 সালে কমে গিয়ে হয়েছে 40 একই সময়ের মধ্যে ** স্থূল (crude) জন্মের হার হ্রাস পেয়ে 21.4 এবং *** মৃত্যুর হার হ্রাস পেয়ে 7 হয়েছে। দেশের ভবিষ্যত অগ্রগতির মূল্যায়নের জন্য গড় আয়ু বৃদ্ধি এবং শিশু যত্নের উন্নতি দরকার। দীর্ঘায়ু আত্মনির্ভর দ্বারা চিহ্নিত জীবনের ভালো মানের একটি সূচক। শিশুদের সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা এবং মা ও শিশু যত্নের সাথে পুষ্টি নিশ্চিতকরণের উপর শিশুমৃত্যুর হার হ্রাস নির্ভর করে।

উৎস: National Health Profile, 2015. (UN-HDR, 2016) SRS Report 2015, Office of the Registrar General and Census Commissioner, India.

চলো আলোচনা করি

2.2 সারণিটি পর্যবেক্ষণ করো এবং নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।

1. 1951 সাল থেকে 2015 পর্যন্ত ডিসপেনসারির বৃদ্ধির হার কত?
2. 1951 সাল থেকে 2015 পর্যন্ত চিকিৎসক এবং সেবক/সেবিকার বৃদ্ধির হার কত?

** শিশুমৃত্যুর হার হল এক বছরের কম বয়সি শিশুর মৃত্যুর হার।*

*** জন্ম হার হল একটি নির্দিষ্ট সময়ে 1000 জন মানুষের মধ্যে সেখানে জন্মগ্রহণকারী শিশুদের সংখ্যা*

****মৃত্যুর হার হল প্রতি 1000 জন লোকের মধ্যে মৃত্যুর সংখ্যা।*

সারণি 2.2 : বিগত বছরগুলিতে স্বাস্থ্যের পরিকাঠামো

	2013	2014	2015
H SC/PHC/CHC	181139	182709	184359
ডিসপেনসারি এবং হাসপাতাল	29274	29715	29957
শয্যা (সরকারি)	628708	675779	754724
(2015) প্রতিবছর নথিভুক্ত অ্যালোপ্যাথি চিকিৎসক	37085	22411	10313
সেবক/সেবিকা (ANM+RN&RM+LHV)	2344241	2621981	2639229

SC: উপস্বাস্থ্যকেন্দ্র (Sub Centre), PHC : প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (Primary Helath Centre) , CHC : সামাজিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র (Community Health Centre)। ANM - Auxiliary Nurse Hydrides, RN & RM :- Registered Nurse and Registered Midwives, LHV : Lady Health Visitors.

উৎস : National Health Policy, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

3. তুমি কি মনে কর চিকিৎসক এবং সেবক/সেবিকার সংখ্যার বৃদ্ধি ভারতের জন্য যথেষ্ট ? যদি না হয়, তবে কেন?
4. তুমি হাসপাতালে অন্যান্য কী কী সুযোগসুবিধা প্রত্যাশা কর?
5. যে হাসপাতাল তুমি পরিদর্শন করেছ তা সম্পর্কে আলোচনা করো।
6. এই সারণিটি ব্যবহার করে তুমি কি একটি লেখচিত্র আঁকতে পারবে?

ভারতবর্ষে এমন অনেক জায়গা আছে যেখানে এই ন্যূনতম সুযোগসুবিধাগুলি নেই। দেশে মাত্র 381টি মেডিকেল কলেজ এবং 301 টি ডেন্টাল কলেজ আছে। মাত্র চারটি রাজ্যে যথা অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র এবং তামিলনাড়ুতে অধিকাংশ কলেজ আছে।

কার্যাবলি

কাছাকাছি সরকারি অথবা বেসরকারি হাসপাতাল পরিদর্শন করো এবং নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লিপিবদ্ধ করো ঃ

যে হাসপাতাল তুমি পরিদর্শন করছে তার শয্যা সংখ্যা কত?

হাসপাতালে কতজন চিকিৎসক আছেন? ওই হাসপাতালে কতজন সেবক/সেবিকা কাজ করেন? তাছাড়া নিম্নলিখিত অতিরিক্ত তথ্যগুলি একত্রিত করার চেষ্টা করো :

তোমার এলাকায় কয়টি হাসপাতাল আছে?

তোমার এলাকায় কয়টি ডিসপেনসারি আছে?

বেকারত্ব

সাকালের মা শীলা গৃহস্থালির কাজকর্ম ও সন্তানদের দেখাশোনা করত এবং তার স্বামী বুটাকে মাঠে কাজে সাহায্য করত। সাকালের ভাই জীতু এবং বোন সীতু খেলাধূলা করে এবং ঘোরাঘুরি করে তাদের সময় কাটাত। তুমি কি শীলা বা জীতু বা সীতুকে বেকার বলতে পারো? যদি না, তবে কেন?

বেকারত্বের অস্তিত্ব বলতে বোঝায় যখন চলতি মজুরিতে

লোক কাজ করতে চায় কিন্তু কাজ পায় না। শীলা তার ঘরের পরিসরের বাইরে কাজ করতে উৎসাহী ছিলেন না। জীতু এবং সীতু এত ছোটো যে তাদেরকে কর্মক্ষম জনসংখ্যার মধ্যে গণনা করা যায় না। জীতু, সীতু বা শীলাকে বেকার বলেও গণনা করা যায় না। 15 থেকে 59 বয়ঃসীমার কোনো ব্যক্তিকে কর্মক্ষম জনসংখ্যায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়। সাকালের ভাই এবং বোন এই বয়ঃসীমার মধ্যে পড়ে না, সুতরাং তাদেরকে বেকার বলা যেতে পারে না। সাকালের মা শীলা তার পরিবারের জন্য কাজ করে। সে তার ঘরের পরিসরের বাইরে মজুরির বিনিময়ে কাজ করতে ইচ্ছুক ছিল না। তাকেও বেকার বলা যেতে পারে না। সাকালের দাদু-ঠাকুরমাকে (যদিও গল্পে উল্লেখ করা হয়নি) বেকার বলা যেতে পারে না।

ভারতের ক্ষেত্রে আমরা শহরাঞ্চলে এবং গ্রামাঞ্চলে বেকারত্ব দেখতে পাই। যদিও বেকারত্বের প্রকৃতি শহরাঞ্চলে এবং গ্রামাঞ্চলে আলাদা। গ্রামাঞ্চলে মরশুমি বেকারত্ব এবং ছদ্ম বেকারত্ব দেখা যায়। শহরাঞ্চলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই শিক্ষিত বেকারত্ব দেখা যায়।

মরশুমি বেকারত্ব বলতে বোঝায় যখন বছরের কিছু মাসে লোকেরা কাজ পেতে অসমর্থ হয়, যে সমস্ত লোকেরা কৃষির উপর নির্ভরশীল তারা সাধারণত এই ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। ব্যস্ত মরশুমে বীজবপন, ফসলকাটা, আগাছা পরিষ্কার এবং ফসল মাড়াই করা হয়। বছরের কয়েক মাস কৃষির উপর নির্ভরশীল লোকেরা সেরকম কোনো কাজ পায় না।

ছদ্মবেকারত্বের ক্ষেত্রে মনে হয় লোকেরা কাজে নিযুক্ত আছে। তাদের কৃষিক্ষেত্র আছে যেখানে তারা কাজ করে। এটি সাধারণত কৃষিক্ষেত্রে নিযুক্ত পরিবারের সদস্যদের মধ্যে দেখা যায়। কাজের জন্য পাঁচজন লোক দরকার কিন্তু আটজন লোক নিযুক্ত আছে। এই তিনজন লোক হচ্ছে অতিরিক্ত। এই তিনজন লোক একই জমিতে অন্যদের সাথে কাজ করে। এই অতিরিক্ত তিনজনের উৎপাদন পাঁচজনের মোট উৎপাদনে কোনো কিছু যোগ করতে পারে না। যদি তিনজন লোককে সরানো হয় তাহলে জমির উৎপাদনশীলতা কমবে না। জমিতে কাজ করার জন্য পাঁচজন লোকের দরকার এবং তিনজন অতিরিক্ত লোক হচ্ছে ছদ্মবেকার।

শহরাঞ্চলে শিক্ষিত বেকারত্ব হচ্ছে একটি সাধারণ ঘটনা। অনেক মাধ্যমিক, স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারী যুবক-যুবতিরা কাজ খুঁজে পায় না। একটি সমীক্ষাতে দেখা যায় যে, মাধ্যমিক বা তার সমতুল্য ডিগ্রিধারীদের থেকে স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর স্তরে বেকারত্ব খুব দ্রুতহারে বাড়ছে। একটি পরস্পরবিরোধী জনশক্তির অবস্থা সামনে এসেছে যেখানে কিছু বিশেষ শ্রেণির মধ্যে জনশক্তি অনেকটা বেশি এবং সেইসঙ্গে কিছু অন্য শ্রেণির মধ্যে এই জনশক্তি কম পরিমাণে বিদ্যমান। একদিকে যেমন প্রযুক্তিগত বেকারত্ব দেখা যায় অন্যদিকে অর্থনৈতিক উন্নতির জন্য প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত দক্ষতার অভাব রয়েছে।

বেকারত্বের ফলে জনশক্তির দক্ষতা বা তৎপরতার অপচয় হয়, মানুষ যারা অর্থনীতির একটি সম্পদ তারা একটি বোঝা বা দায়ে পরিণত হয়, যুব সমাজের মধ্যে হতাশা এবং নিরাশার একটি অনুভূতির সৃষ্টি হয়। তাদের পরিবার প্রতিপালনের জন্য লোকদের হাতে যথেষ্ট টাকাপয়সা থাকে না। শিক্ষিত মানুষ যারা উপযুক্ত কর্মসংস্থান খুঁজতে ব্যর্থ, তাদের ব্যর্থতাকে সমাজের একটি বিরাট ক্ষতি বলে গণ্য করা হয়।

বেকারত্ব অর্থনৈতিক বোঝা বৃদ্ধির প্রবণতা সৃষ্টি করে। কর্মক্ষম জনগণের উপর বেকারদের নির্ভরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে ব্যক্তির জীবনযাত্রার মান এবং সেইসঙ্গে সমাজও ভীষণভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে। যখন একটি পরিবারকে জীবনধারণের ন্যূনতম স্তরে বসবাস করতে হয় তখন তার স্বাস্থ্যের অবস্থার অবনতি ঘটে এবং বিদ্যালয়ছুট-এর সংখ্যা বাড়তে থাকে।

অতএব, বেকারত্ব সামগ্রিক অর্থনৈতিক বিকাশের বৃদ্ধির উপর একটি বিরূপ প্রভাব সৃষ্টি করে। বেকারত্বের বৃদ্ধি একটি দুর্বল অর্থনীতির সূচক বা কারণ। এটি সম্পদগুলিও অপচয় করে, যা সঠিকভাবে নিযুক্ত হতে পারত। জনগণকে যদি একটি সম্পদ হিসাবে ব্যবহার করা না যায়, তাহলে স্বাভাবিকভাবেই তাদেরকে অর্থনীতিতে দায় বা বোঝা হিসাবে দেখা হয়।

পরিসংখ্যানগত দিক থেকে, ভারতের ক্ষেত্রে বেকারত্বের হার কম। নিম্ন আয় বা কম উৎপাদনশীলতার সাথে যুক্ত এমন একটি বিশাল সংখ্যক জনগণকে রোজগারি বলে মনে করা হয়। তারা সারাবছর ধরে কাজ করে তাদের সম্ভাব্য ক্ষমতা অনুযায়ী কিন্তু তাদের আয় জীবনধারণের জন্য যথেষ্ট নয়। তারা যে

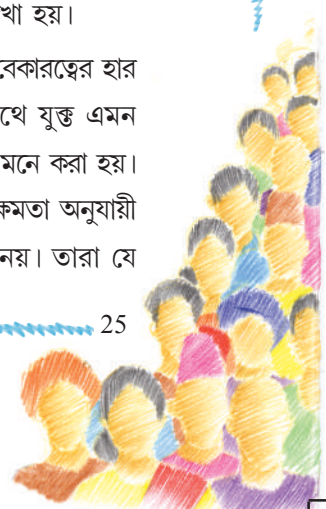

কাজগুলি করছে সেগুলি করতে তাদেরকে বাধ্য করা হচ্ছে বলে মনে হয়। তাই তারা তাদের পছন্দমতো অন্য কাজ করতে চায়। গরিব লোকেরা অলসভাবে বসে উপার্জন করতে পারে না। তারা তাদের উপার্জন সম্ভাব্য নির্বিশেষে যে-কোনো কাজে

চিত্র 2.6 : *একটু ভেবে দেখো তো সে তোমার জুতো বা চপ্পল সেলাই করে দিলে তাকে কত টাকা দাও?*

নিজেদেরকে নিযুক্ত করে। তাদের উপার্জন তাদেরকে জীবনধারণের ন্যূনতম স্তরে রাখে।

প্রকৃতপক্ষে, প্রাথমিক ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান কাঠামো মূলত স্বনির্ভর প্রকল্পযুক্ত। যদিও সবার প্রয়োজন হয় না তবুও সম্পূর্ণ পরিবারের সদস্যরা মাঠে কাজ করে। সুতরাং কৃষিক্ষেত্রে ছদ্মবেকারত্ব দেখা যায়। কিন্তু সমস্ত পরিবার তার উৎপন্ন দ্রব্য ভোগ করে। কর্মক্ষেত্রে এবং উৎপাদিত দ্রব্যের অংশীদারিত্বের এই ধারণার ফলে গ্রামাঞ্চলে বেকারত্বের প্রকোপ হ্রাস পায়। কিন্তু এটি পরিবারের দারিদ্র্য কমাতে পারে না, ধীরে ধীরে প্রতিটি পরিবার থেকে উদ্বৃত্ত শ্রম গ্রাম থেকে চাকুরির খোঁজে অন্যত্র চলে যায়।

চলো আমরা পূর্বে আলোচিত তিনটি ক্ষেত্রের কর্মসংস্থানের পরিস্থিতি সম্পর্কে আলোচনা করি। কৃষি হচ্ছে অর্থনীতির সবচেয়ে বেশি শ্রমযুক্ত ক্ষেত্র। সাম্প্রতিককালে, কৃষিতে জনসংখ্যার নির্ভরশীলতা আংশিকভাবে ছদ্মবেকারত্বের কারণে কমেছে যা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। কৃষিক্ষেত্রের কিছু উদ্বৃত্ত শ্রম মাধ্যমিক বা সেবাক্ষেত্রে স্থানান্তরিত হয়েছে। মাধ্যমিক ক্ষেত্রে, ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলি সবচেয়ে বেশি শ্রমনিয়োগকারী। সেবা ক্ষেত্রে, আজকাল অনেক নতুন নতুন ক্ষেত্রের আবির্ভাব ঘটেছে যেমন - বায়োটেকনোলজি, তথ্য প্রযুক্তি প্রভৃতি।

একটি গ্রামের অর্থনীতির জন্য মানুষ কীভাবে একটি সম্পদ হতে পারে তা জানতে চলো আমরা একটি গল্প পড়ি।

একটি গ্রামের কাহিনি

একটি গ্রাম ছিল, যেখানে অনেকগুলি পরিবার বসবাস করত। প্রত্যেক পরিবার যথেষ্ট পরিমাণ উৎপাদন করত যা দিয়ে পরিবারের সদস্যরা খাওয়া দাওয়া সম্পূর্ণ করতে পারত। প্রত্যেক পরিবারের সদস্যরা নিজেদের কাপড় নিজেরাই বুনত এবং শিশুদের নিজেরাই শিক্ষা দান করত, এভাবে পরিবারগুলি নিজেদের প্রয়োজন নিজেরাই মেটাত। এর মধ্যে একটি পরিবার তাদের একটি ছেলেকে কৃষি মহাবিদ্যালয়ে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। ছেলেটি নিকটবর্তী একটি কৃষি মহাবিদ্যালয়ে ভরতির সুযোগ পেয়ে গেল। কিছু সময় পরে সে কৃষি-ইঞ্জিনিয়ারিং পাঠ শেষ করে গ্রামে ফিরে আসল। সে নিজের সৃজনশীলতার প্রমাণ দিল এবং একটি উন্নত ধরনের লাঙল তৈরি করল যার সাহায্যে গমের উৎপাদনে বৃদ্ধি পেয়েছিল। এইভাবে অ্যাগ্রো-ইঞ্জিনিয়ারিং-এর একটি নতুন কাজ উদ্ভাবন হল এবং এই গ্রামেই তা পূরণ হল। গ্রামের ওই পরিবারটি উদ্বৃত্ত ফসল নিকটবর্তী গ্রামে বিক্রি করে দিল। তারা ভালো মুনাফা অর্জন করল যেটা তারা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নিল। এই সফলতা থেকে প্রেরণা নিয়ে গ্রামের অন্যান্য পরিবারগুলি কিছু সময় পর এক বৈঠকে মিলিত হয়। তারাও তাদের সন্তানদের জন্য একটি সুন্দর ভবিষ্যতের ইচ্ছা প্রকাশ করে। তারা পঞ্চায়েতকে অনুরোধ করল যেন গ্রামে একটি বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। তারা সবাই পঞ্চায়েতকে আশ্বস্ত করল যে তারা তাদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাবে। সরকারি সহায়তায় পঞ্চায়েত একটি বিদ্যালয় খুলে দিল। কাছাকাছি শহর থেকে একজন শিক্ষককে সেখানে নিযুক্ত করা হল। এই গ্রামের সমস্ত শিশুরা বিদ্যালয়ে যেতে শুরু করল। কিছু

সময় পরে গ্রামের একটি পরিবার নিজেদের এক কন্যা সন্তানকে সেলাই এর উপর প্রশিক্ষণ দিল। সে এখন গ্রামের সকল পরিবারের জন্য কাপড় সেলাই করতে শুরু করল কেননা এখন সবাই ভালোভাবে সেলাই করা কাপড় কিনতে ও পরিধান করতে চায়। এভাবে দর্জির একটি নতুন কাজ সৃষ্টি হল। এর আরও একটি ইতিবাচক দিকও ছিল। কৃষকদের কাপড় কেনার জন্য আগে দূরে যেতে হত, সে সময়টা বেঁচে গেছে। যেহেতু কৃষকরা জমিতে অধিক সময় দিতে পারল, এতে করে তাদের উৎপাদনও বেড়ে গেল। এটা ছিল সমৃদ্ধির সূচনা। কৃষকদের কাছে এখন তাদের ভোগের অধিক বস্তু ছিল। এখন তারা তাদের উৎপাদিত বস্তু সেইসব লোকেদের কাছে বিক্রি করতে পারে যারা তাদের গ্রামের বাজারে আসে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে এই গ্রাম, যেখানে শুরু থেকে কোনো নতুন কাজের সুযোগসুবিধা ছিল না, সেখানে এখন শিক্ষক, দর্জি, অ্যাগ্রো-ইঞ্জিনিয়ার এবং আরও অনেক রকম লোকে পরিপূর্ণ হয়েছে। এই ছিল একটি সাধারণ গ্রামের কাহিনি, যেখানে মানব মূলধন-এর ক্রমাগত বৃদ্ধি সেই গ্রামটিকে জটিল এবং আধুনিক অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপের স্থান হিসাবে বিকশিত করেছে।

সারাংশ

তোমরা দেখেছ যে কীভাবে শিক্ষা এবং স্বাস্থ্যের মতো বিভিন্ন বিষয়গুলি মানুষকে একটি অর্থনীতির জন্য সম্পদ হিসেবে তৈরি করতে সাহায্য করে। এই অধ্যায়ে অর্থনীতির তিনটি ক্ষেত্রের মধ্যে ঘটে চলা অর্থনৈতিক কার্যকলাপগুলি সম্বন্ধেও আলোচনা করা হয়েছে। আমরা বেকারত্ব সম্বন্ধীয় সমস্যাগুলিও পড়েছি। শেষ ভাগে অধ্যায়টি শেষ হয়েছে একটি গ্রামের কাহিনির মাধ্যমে যেখানে আগে কোনো চাকুরি বা কর্মসংস্থান ছিল না কিন্তু পরে রোজগারের অনেক সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে।

অনুশীলনী

1. 'সম্পদ হিসাবে মানুষ' বলতে কী বোঝ?
2. জমি এবং বস্তুগত মূলধনের মতো অন্যান্য সম্পদ থেকে মানব সম্পদ কীভাবে আলাদা?
3. মানব মূলধন গঠনে শিক্ষার ভূমিকা কী?
4. মানব মূলধন গঠনে স্বাস্থ্যের ভূমিকা কী?
5. কোনো লোকের কর্মজীবনে স্বাস্থ্যের ভূমিকা কী?
6. প্রাথমিক, মাধ্যমিক এবং সেবাক্ষেত্রে বিভিন্ন কার্যকলাপগুলি কী কী?
7. অর্থনৈতিক কার্যকলাপ এবং অ-অর্থনৈতিক কার্যকলাপের মধ্যে পার্থক্য কী?
8. মহিলাদের নিম্নবেতনযুক্ত কাজে নিয়োজিত করা হয় কেন?
9. 'বেকারত্ব' শব্দটিকে তুমি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে?
10. ছদ্ম বা প্রচ্ছন্ন বেকারত্ব এবং মরশুমি বেকারত্বের মধ্যে পার্থক্য লেখো।
11. শিক্ষিত বেকারত্ব ভারতবর্ষের একটি বিশেষ সমস্যা কেন?
12. তোমার মতে ভারতবর্ষে কোন্ ক্ষেত্রে রোজগারের সর্বাধিক সুযোগ সৃষ্টি হতে পারে?
13. তুমি কি শিক্ষিত বেকারত্বের সমস্যা সমাধানে শিক্ষা ব্যবস্থায় কোনো উপায় বের করার ধারণা দিতে পারো?

14. তুমি কি এমন কোনো গ্রামের কল্পনা করতে পারো যেখানে আগে রোজগারের কোনো সুযোগ ছিল না কিন্তু পরে অনেকগুলি হয়েছে?

15. কোন্ মূলধনকে তুমি শ্রেষ্ঠ মনে করো - জমি, শ্রম, বস্তুগত মূলধন এবং মানব মূলধন ? কেন?

References

GARY, S. BECKER. 1966. *Human Capital*: *A Theoretical and Empirical Analysis with Special Reference to Education*, General Series. Number 80. New York. National Bureau of Economic Research.

THEODORE, W. SCHULTZ. 'Investment in Human Capital'. *American Economic Review.* March 1961.

Economic Survey 2015–2016. Ministry of Finance, Government of India, New Delhi.

India Vision 2020. The Report. Planning Commission. Government of India, New Delhi.

Mid-Term Appraisal of the Tenth Five Year Plan (2002–2007). Planning Commission, Part II. New Delhi.

Tenth Five Year Plan (2002–2007). Planning Commission, New Delhi.

Twelth Five Year Plan (2012–2017). Planning Commission, New Delhi.

NCERT. 2016. *Trilingual Dictionary of Economics,* p. 62.

৩
অধ্যায়

দারিদ্র্য একটি সমস্যা

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

এই অধ্যায়ের মূল আলোচ্য বিষয় হল দারিদ্র্য যা স্বাধীন ভারতবর্ষের একটি কঠিন সমস্যা। এই অধ্যায়ে বিভিন্ন উদাহরণ সহযোগে দারিদ্র্যের বহুমাত্রিক সমস্যা আলোচনার পর সমাজ বিজ্ঞানে দরিদ্রতাকে কীভাবে দেখা হবে তা আলোচনা করা হয়েছে। ভারতবর্ষে ও বিশ্বে দারিদ্র্যের প্রবণতার ধারণা বিভিন্ন উদাহরণসহযোগে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। দারিদ্র্যের বিভিন্ন কারণ এবং সরকার কর্তৃক দারিদ্র্য দূরীকরণে গৃহীত পদক্ষেপসমূহ আলোচনা করা হয়েছে। সরকারিভাবে দারিদ্র্যের ধারণাটি মানব দারিদ্র্যের আঙিনায় প্রসারিত করে অধ্যায়টি শেষ করা হয়েছে।

সূচনা

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা এমন অনেক লোকের সম্মুখীন হই যাদেরকে আমরা গরিব মনে করি। তারা হতে পারে গ্রামের ভূমিহীন শ্রমিক অথবা শহরের কোনো ঘনবসতিপূর্ণ বস্তির বাসিন্দা। তারা হতে পারে কোনো নির্মাণ কাজের দৈনিক হাজিরা কর্মী অথবা কোনো ধাবায় (Dhabas) নিয়োজিত শিশুশ্রমিক। আবার তারা হতে পারে ছেঁড়া কাপড় পরিধানরত শিশুসহ কোনো ভিক্ষুক। আমাদের চারদিকে আমরা দরিদ্রতা দেখতে পাই। আদতে ভারতবর্ষে প্রতি চারজন নাগরিকের মধ্যে একজন দরিদ্র। এর মানে হল মোটামুটিভাবে প্রায় 270 মিলিয়ন (27 কোটি) লোক ভারতবর্ষে দারিদ্র্যতার সহিত বাস করে, এটা 2011-12 সালের ধারণা অনুযায়ী। এটার আরও মানে দাঁড়ায় এই যে, বিশ্বের মধ্যে ভারতবর্ষ হল দরিদ্রের বৃহত্তম একক সমাবেশ। এটা এই চ্যালেঞ্জের গভীরতা চিত্রিত করে।

দারিদ্র্যের দুটি বিশেষ ঘটনা

একটি শহরের ঘটনা

ঝাড়খণ্ডের রাঁচি শহরের কাছে একটি আটার মিলে 33 বছর বয়সি রামসরণ দৈনিক হাজিরা শ্রমিক হিসেবে কাজ করে। যখন সে কাজ পেত তখন মাসিক আনুমানিক 1500 টাকা উপার্জন করে সংসার পরিচালন করত তাও সেটা সবসময় হত না। এই টাকাটা তার ছয় সদস্যের পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখার পক্ষে যথেষ্ট নয় যার মধ্যে তার স্ত্রী এবং 12 বছর থেকে 6 মাস পর্যন্ত চার সন্তান

চিত্র 3.1 : *রামসরণের কাহিনি*

বর্তমান। রামগড়ের নিকট একটি গ্রামে যেখানে তার পিতা-মাতা বাস করে তাঁদের কাছেও তাকে টাকা পাঠাতে হয়। তার বাবা একজন ভূমিহীন শ্রমিক যিনি রাম সরণের উপর নির্ভরশীল এবং তার ভাই জীবিকার জন্য হাজারিবাগে বসবাস করে। রামসরণ শহরতলীর জনবহুল একটি বস্তিতে এক কামরার একটি বাড়িতে ভাড়া থাকে। এটি ইট এবং মাটির টালি দিয়ে তৈরি একটি অস্থায়ী কুটির। তার স্ত্রী শান্তা দেবী, কিছু সংখ্যক বাড়িতে ঠিকা কাজ করে 800 টাকা উপার্জন করে। তারা দৈনিক দুইবেলা স্বল্প পরিমাণ ডাল ভাতের বন্দোবস্ত করতে পারে, কিন্তু এটা তাদের সবার পক্ষে যথেষ্ট নয়। তার বড়ো ছেলে একটি চায়ের দোকানে সাহায্যকারী হিসেবে কাজ করে 300 টাকা উপার্জন করে পরিবারকে সহায়তা করে, তার 10 বছর বয়সি মেয়ে ছোটো ভাইবোনদের দেখাশোনা করে। কোনো ছেলেমেয়ে বিদ্যালয়ে যায় না। তাদের প্রত্যেকের উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত দুই জোড়া করে কাপড় বর্তমান। নতুন কাপড় তখনই আসে যখন পুরোনোগুলি পরিধান অযোগ্য হয়ে পড়ে। জুতো হল বিলাসবহুল। সবচেয়ে ছোটো বাচ্চাটি হল অপুষ্টির শিকার। তাদের কাছে স্বাস্থ্য সুরক্ষা উপলব্ধি করার ক্ষমতা নেই যখন তারা অসুস্থ হয়ে পড়ে।

একটি গ্রামের ঘটনা

লখা সিং উত্তর প্রদেশের মীরাটের কাছে একটি ছোটো গ্রামে বসবাস করে। তার পরিবারের নিজস্ব কোনো জমি নেই, সুতরাং তারা বড়ো বড়ো কৃষকদের কাছে এটা-ওটা কাজ করে থাকে। কাজ এবং আয় দুটোই অনিশ্চিত। সারাদিন কঠিন পরিশ্রমের পর মজুরি হিসেবে 50 টাকা পায়। কিন্তু প্রায়ই এই মজুরি দ্রব্যের আকারে দেওয়া হয়, যেমন- সামান্য কয়েক কিলোগ্রাম গম বা ডাল বা এমনকি সবজির জন্যও সারাদিন জমিতে খুব পরিশ্রম করতে হত। আট সদস্যের পরিবারটি সবসময় যথাযথভাবে দুই বেলা খাবারের বন্দোবস্ত করতে পারে না। লখা সিং গ্রামের শেষ প্রান্তে একটি কাঁচা কুঁড়েঘরের মধ্যে বসবাস করে। পরিবারের মহিলারা সারাদিন জমিতে ফসল কাটার কাজ করে এবং জমি থেকে জ্বালানোর জন্য লাকড়ির জোগাড়ও করে থাকে। তার বাবা টি বি রোগে আক্রান্ত ছিলেন, দুই বৎসর আগে বিনা চিকিৎসায় মারা যান। তার মাও একই রোগে আক্রান্ত এবং তার জীবনও আস্তে আস্তে ক্ষীণ হয়ে যাচ্ছে। যদিও গ্রামে একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে, লখা কোনোদিন সেখানে যায়নি। সে 10 বছর বয়স থেকেই উপার্জন শুরু করেছিল। নতুন কাপড় কিনতে কয়েক বছর লেগে যায়। এমনকি সাবান এবং তেলও তাদের কাছে বিলাসবহুল দ্রব্য।

চিত্র 3.2 ঃ *লখা সিং-এর কাহিনি*

উপরোক্ত দারিদ্র্যের কাহিনিগুলি অধ্যয়ন করো এবং নিম্নলিখিত দারিদ্র্য সম্পর্কযুক্ত বিষয়গুলি আলোচনা করো —

- ভূমিহীনতা
- বেকারত্ব
- পরিবারের সদস্য সংখ্যা
- অশিক্ষা
- খারাপ স্বাস্থ্য/অপুষ্টি
- শিশু শ্রম
- অসহায়ত্ব

উপরের দুইটি বিশেষ কাহিনি দরিদ্রতার অনেক দিক বা মাত্রা নির্দেশ করে। এগুলি দেখায় যে, দরিদ্রতা মানে হল ক্ষুধা এবং আশ্রয়হীনতা। এখানে আরও একটি পরিস্থিতি হল যেখানে পিতা-মাতারা তাঁদের সন্তানদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে পারে না অথবা অসুস্থ লোক চিকিৎসা করাতে পারে না। দরিদ্রতার অর্থ স্বচ্ছ জল এবং সাফাইয়ের সুবিধার অভাবকেও বোঝায়। এর অর্থ ন্যূনতম সম্মান স্তরে নিয়মিত কর্মসংস্থানকেও বোঝায়। সর্বোপরি এটি বোঝায় অসহায়ত্বের মধ্য দিয়ে বেঁচে থাকা। জমিতে, কারখানায়, সরকারি অফিসে, হাসপাতালে, রেলস্টেশনে প্রায় সব জায়গায় দরিদ্র লোকেদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা হয়ে থাকে। সুতরাং দরিদ্রতার সঙ্গে কেউ বাঁচতে চায় না।

স্বাধীন ভারতের একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ হল দরিদ্রতার দুর্দশাগ্রস্ত অবস্থা থেকে কোটি কোটি মানুষকে মুক্ত করা। মহাত্মা গান্ধি সবসময় এ বিষয়ে জোর দিতেন যে ভারত তখনই প্রকৃত অর্থে স্বাধীন হবে যখন অতীব দরিদ্র ব্যক্তিটিও আত্মযন্ত্রণা থেকে মুক্তি পাবে।

সমাজ বিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে দরিদ্রতা

যেখানে দরিদ্রতার অনেক দিক আছে বর্তমানে সমাজ বিজ্ঞানীরা এটাকে অনেক সূচকের মাধ্যমে দেখেন। সাধারণত সূচকগুলি আয়স্তর এবং ভোগের উপর নির্ভর করে। কিন্তু এখন দরিদ্রতাকে নিরক্ষরতার স্তর, অপুষ্টির জন্য রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতার অভাব, স্বাস্থ্য পরিসেবার অভাব, কর্মসংস্থানের অভাব, বিশুদ্ধ পানীয় জল, স্বচ্ছতার অভাব প্রভৃতি সামাজিক সূচকের মাধ্যমেও দেখা যেতে পারে। সামাজিক বঞ্চনা এবং অসুরক্ষার উপর ভিত্তি করে যে দরিদ্রতা সেটা এখন সাধারণ আলোচনার বিষয় হয়ে গেছে।

সামাজিক বঞ্চনা

এই ধারণা অনুসারে, দরিদ্রতাকে এইভাবে দেখা যেতে পারে যে, দরিদ্রলোক ভালো ও সুস্বাস্থ্য যুক্ত পরিবেশে থাকা এবং সমস্ত সুযোগসুবিধা ভোগ করা সামাজিক মানুষদের দ্বারা বঞ্চিত হয়ে অন্যান্য দরিদ্র লোকদের সঙ্গে বসবাস করতে বাধ্য থাকে। সাধারণ অর্থে সামাজিক বঞ্চনা দরিদ্রতার একটি কারণ অথবা ফল দুই-ই হতে পারে। মোটের উপর এটা বলা যেতে পারে যে, এটা একটা প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তি বা গোষ্ঠী সেইসব সুবিধা, লাভ এবং সুযোগ থেকে বঞ্চিত থাকে সেটা অন্যেরা (তাদের চেয়েও ভালো) উপভোগ করে। এর একটি বিশেষ উদাহরণ হল, ভারতবর্ষে জাতিগত ব্যবস্থার কার্যশৈলী, যেখানে কিছু জাতির লোকেদের সমান অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছিল। সামাজিক বঞ্চনা কম আয় উপার্জন থেকেও আরও অধিক ক্ষতি করতে পারে।

অসুরক্ষা

অসুরক্ষা দারিদ্রতার একটি মাপ, যা বর্ণনা করে, কিছু বিশেষ গোষ্ঠী (যেমন কোনো পশ্চাদপদ জাতির সদস্য) অথবা ব্যক্তি (যেমন কোনো বিধবা বা শারীরিকভাবে অক্ষম কোনো ব্যক্তি) ভবিষ্যতে দরিদ্র হওয়া বা দরিদ্র হয়ে থাকার প্রবল সম্ভাবনা। বিভিন্ন গোষ্ঠী বা সম্প্রদায়ের কাছে অসুরক্ষা নির্ধারিত হয় সম্পত্তি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য বা রোজগারের সুযোগের মাধ্যমে ভালোভাবে জীবিকা নির্বাহ করা। পুনরায়, এর বিশ্লেষণে কোনো সম্প্রদায়ের সামনে বিদ্যমান কোনো বড়ো ঝুঁকি হয়ে থাকে যেমন- প্রাকৃতিক বিপর্যয় (ভূমিকম্প, সুনামি), উগ্রপন্থা ইত্যাদি। অতিরিক্ত বিশ্লেষণেও বলা যেতে পারে এই ঝুঁকিগুলির বিরুদ্ধে লড়াই নির্ভর করে তাদের সামাজিক এবং আর্থিক ক্ষমতার উপর। বাস্তবে, অসুরক্ষা বর্ণনা করা হয় অন্য লোকেদের তুলনায় অধিক বিরূপ প্রভাবিত লোকেদের অবস্থার। সে বন্যা হোক বা ভূমিকম্প বা চাকুরির ক্ষেত্রে ক্ষীণ সম্ভাবনা প্রভৃতি যখন সবাইকে ক্ষতিগ্রস্ত করে তখন কিন্তু আর্থিকভাবে দুর্বল লোকেরা অধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

দারিদ্র্যরেখা

সাধারণত দারিদ্র্য সম্পর্কিত আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে ‘দারিদ্র্যরেখার’ ধারণা। দরিদ্রতা পরিমাপ করার একটি সাধারণ নিয়ম নির্ভর করে প্রধানত আয় এবং ভোগস্তরের উপর। একজন

লোককে দরিদ্র বলা হবে যদি তার আয় বা ভোগস্তর কোনো 'ন্যূনতম স্তর' থেকে নীচে নেমে যায় যেটা মূল অত্যাবশ্যকীয় ভোগ পূরণের জন্য আবশ্যক। মূল অত্যাবশ্যকীয় ভোগ পূরণ করার জন্য আবশ্যিক দ্রব্য বিভিন্ন সময় ও বিভিন্ন দেশের বিবেচনায় ভিন্ন হয়। সুতরাং দারিদ্র্যরেখা, সময় এবং স্থানভেদে ভিন্ন হতে পারে। প্রত্যেক দেশ এর জন্য একটি কাল্পনিক রেখা ব্যবহার করে, যেটা ওই দেশের বিকাশ এবং তার স্বীকৃত ন্যূনতম সামাজিক মানদণ্ডের বর্তমান স্তর অনুসারে হয়ে থাকে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, আমেরিকাতে কোনো লোকের নিজস্ব গাড়ি না থাকলে তাকে দরিদ্র বলা হয়। কিন্তু ভারতে এখনও নিজস্ব গাড়ি থাকা একটি বিলাসিতার পর্যায়ে পড়ে। ভারতে দারিদ্র্যরেখা নির্ধারণ করার সময় জীবন জীবিকা নির্বাহ করার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য, কাপড়, জুতো, জ্বালানি ও বিদ্যুৎ, শিক্ষা এবং স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই জাতীয় দ্রব্যগুলির পরিমাণকে তাদের দামের সাথে গুণ করে বা আর্থিক মূল্যে হিসেব করে টাকায় প্রকাশ করা হয়। দারিদ্র্যরেখা হিসেব বা নির্ধারণ করার জন্য বর্তমান সূত্রে যে প্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্য দরকার তা নির্ভর করে ক্যালোরির প্রয়োজনীয়তার উপর। খাদ্যদ্রব্য যেমন : চাল, ডাল, সবজি, দুধ, তেল, চিনি ইত্যাদি একসাথে মিলে যতটুকু এই প্রয়োজনীয় ক্যালোরির যোগান দেয়। বয়স, লিঙ্গ এবং কাজের ধরনের উপর কোনো ব্যক্তির প্রয়োজনীয় ক্যালোরির পরিমাণ নির্ভর করে। ভারতবর্ষে স্বীকৃত ক্যালোরির প্রয়োজনীয়তা হল গ্রামাঞ্চলের অধিবাসীদের ক্ষেত্রে দৈনিক 2400 ক্যালোরি এবং শহরাঞ্চলের অধিবাসীদের ক্ষেত্রে দৈনিক 2100 ক্যালোরি। যেহেতু গ্রামাঞ্চলের লোকেরা শারীরিকভাবে বেশি পরিশ্রম করে থাকে। তাই শহরাঞ্চলের লোকেদের তুলনায় তাদের ক্যালোরির প্রয়োজন একটু বেশি হয়। এইসব খাদ্যদ্রব্যের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ক্যালোরি কেনার জন্য জন প্রতি যে আর্থিক ব্যয়, দ্রব্যের দাম বৃদ্ধির সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে সময়ে সময়ে সেটা সংশোধন করা হয়ে থাকে।

উপরের এই হিসেবগুলির উপর নির্ভর করে, 2011-12 সালে, গ্রামাঞ্চলের জন্য দারিদ্র্যরেখা স্থির হয়েছে জনপ্রতি মাসিক 816 টাকা এবং শহরাঞ্চলের জন্য 1000 টাকা। প্রয়োজনীয় ক্যালোরি কম হওয়া সত্ত্বেও, শহরাঞ্চলের জন্য টাকার পরিমাণ বেশি রাখা হয়েছে কারণ শহরাঞ্চলে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যগুলির দাম তুলনামূলক বেশি থাকে। এই পথ অনুসরণ করে 2011-12 সালে, গ্রামাঞ্চলের পাঁচ সদস্যের একটি পরিবারের উপার্জন মাসিক 4080 টাকার কম হলে সেক্ষেত্রে পরিবারটি দারিদ্র্যসীমার নীচে অবস্থান করবে। একইরকমভাবে একটি পরিবার শহরাঞ্চলে বসবাস করলে তাদের ন্যূনতম প্রয়োজন মেটাতে মাসিক 5000 টাকার প্রয়োজন হবে। দারিদ্র্যরেখার পরিমাপ সময়ে সময়ে (সাধারণত পাঁচ বছর পর পর) নমুনা নিরীক্ষার (Sample Survey) মাধ্যমে করা হয়ে থাকে। এই নিরীক্ষাগুলির National Sample Survey Organisation (NSSO) করে থাকে। তথাপি, বিভিন্ন উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে তুলনা করার জন্য, বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থা যেমন বিশ্বব্যাংক (World Bank) সমান মানদণ্ডের (Uniform Standard) দারিদ্র্যরেখা ব্যবহার করে থাকে, যেমন ন্যূনতম প্রয়োজনীয়তা অনুসারে জনপ্রতি দৈনিক $ 1.90 (1.9 ডলার)-এর সমতুল্য (2011, PPP)।

চলো আলোচনা করি

নিম্নলিখিতগুলি আলোচনা করো :

- বিভিন্ন দেশ বিভিন্ন দারিদ্র্যরেখার প্রয়োগ করে কেন?
- তোমার মত অনুযায়ী তোমার এলাকায় 'ন্যূনতম অত্যাবশ্যকীয় স্তর' কী হতে পারে?

দারিদ্র্যের পরিমাপ

সারণি 3.1 থেকে এটা স্পষ্ট যে ভারতবর্ষে দারিদ্র্যের শতকরা হার ক্রমহ্রাসমান এবং সেটা 1993-94 সালের প্রায় 45 শতাংশ থেকে কমে 2004-05 সালে 37.2 শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। 2011-12 সালে দারিদ্র্যরেখার নিচে দারিদ্র্যের অনুপাত আরও কমে 21.9 শতাংশ হয়ে গেছে। এই ধারা যদি বজায় থাকে, আগামী কয়েক বছরে দারিদ্র্যরেখার নীচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা 20 শতাংশের নীচে চলে আসবে। যদিও দারিদ্র্যরেখার নিচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা আগের দুই দশকে (1973-1993) কমেছে, দরিদ্র লোকের সংখ্যা 407.1 মিলিয়ন যেটা 2004-05 সালে ছিল, কমে গিয়ে 2011-12 সালে 269.3 মিলিয়ন হয়ে গেছে। যেখানে 2004-05 সাল থেকে 2011-12 সাল পর্যন্ত দারিদ্র্যের সংখ্যার হ্রাসের হার ছিল গড়ে বার্ষিক 2.2 শতাংশ।

সারণি 3.1 ঃ ভারতবর্ষে দারিদ্র্যের পরিমাপ (তেন্ডুলকর পদ্ধতি)

	দারিদ্র্যের অনুপাত (%)			দরিদ্রের সংখ্যা (মিলিয়ন)		
বছর	গ্রাম	শহর	মোট	গ্রাম	শহর	মোট
1993–94	50.7	32	45	329	75	404
2004–05	42	26	37	326	81	407
2009–10	34	21	30	278	76	355
2011–12	26	14	22	217	53	270

উৎস : দারিদ্র্য পরিমাপের জন্য বিশেষজ্ঞ কমিটির কার্যপ্রণালীর সমীক্ষার নমুনা, পরিকল্পনা কমিশন, 2014, ভারত সরকার।

চলো আলোচনা করি

সারণি 3.1 পড়ো এবং নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

- 1993-94 এবং 2004-05 এর মধ্যে যদিও দারিদ্র্যের অনুপাত কমেছে, কিন্তু দরিদ্র লোকের সংখ্যা 407 মিলিয়ন-এ রয়ে গেছে কেন?
- ভারতবর্ষে দারিদ্র্য হ্রাস পাওয়ার হার কি গ্রাম এবং শহর এলাকার ক্ষেত্রে এক সমান?

অসুরক্ষিত গোষ্ঠী

ভারতবর্ষে বিভিন্ন সামাজিক গোষ্ঠী বা অর্থনৈতিক শ্রেণির জন্য দারিদ্র্যরেখার নীচে অবস্থানরত লোকের অনুপাত এক সমান নয়। যেসব সামাজিক গোষ্ঠীগুলি দরিদ্রতার বিবেচনায় সবচেয়ে অসুরক্ষিত সেগুলি হল তপশিলি জাতি এবং তপশিলি উপজাতি পরিবারগুলি। একইভাবে বিভিন্ন অর্থনৈতিক শ্রেণিগুলির মধ্যে সবচেয়ে অসুরক্ষিত শ্রেণিগুলি হল গ্রামীণ কৃষিশ্রমিক পরিবারগুলি এবং শহরের ক্ষেত্রে অনিয়মিত শ্রমিক পরিবারগুলি। এই সমস্ত বিভিন্ন গোষ্ঠী বা শ্রেণিগুলির মধ্যে দরিদ্র লোকের শতকরা হার নিচের 3.1 রেখা চিত্রের (দণ্ডচিত্র) সাহায্যে দেখানো হয়েছে। যদিও ভারতবর্ষে সমস্ত গোষ্ঠী বা শ্রেণিগুলি মিলিয়ে দারিদ্ররেখার নিচে অবস্থানরত লোকের শতকরা হার গড়ে 22 জন। অথচ গ্রামীণ এলাকার তপশিলি উপজাতি লোকেদের 100 জনের মধ্যে 43 জন লোকই তাদের নূন্যতম প্রয়োজন মেটাতে পারে না। একইভাবে শহর এলাকায় 33 শতাংশ অনিয়মিত শ্রমিক দারিদ্র্যরেখার নীচে বসবাস করে। প্রায় 40 শতাংশ ভূমিহীন কৃষি শ্রমিক এবং 29 শতাংশ তপশিলি জাতি সম্প্রদায়ভুক্ত লোক ও দরিদ্র। তপশিলি জাতি বা তপশিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের

লেখচিত্র 3.1 : ভারতবর্ষে দারিদ্র্য 2000 : অসুরক্ষিত গোষ্ঠী

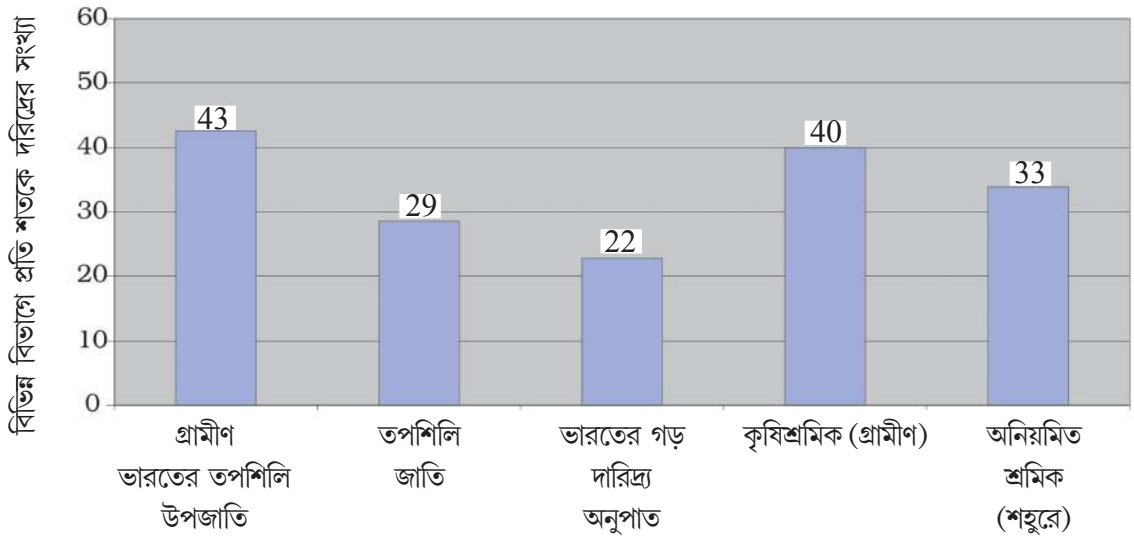

উৎস : পানাগড়িয়া অরবিন্দ এবং বিশাল মোরে।

চিত্র 3.3 *শিবরমণের গল্প*

সামাজিক সুবিধা বঞ্চিত লোকেরা আবার ভূমিহীন অনিয়মিত হাজিরা শ্রমিক হওয়ায় তাদের উভয়দিকের অসুবিধা এবং সমস্যার সংকটজনক অবস্থা দর্শায়। বিগত কিছু সমীক্ষা থেকে দেখা যায় যে, 1990 এর দশকে তপশিলি উপজাতি পরিবারগুলি বাদ দিলে, অন্য তিনটি গোষ্ঠীর (তপশিলি জাতি, গ্রামীণ কৃষিশ্রমিক এবং শহরের অনিয়মিত শ্রমিক পরিবারগুলি) দরিদ্রতার হার কমেছে।

এইসব সামাজিক গোষ্ঠীর বাইরে, একটি পরিবারের মধ্যেও আয়ের ক্ষেত্রে অসাম্য আছে। একটি দরিদ্র পরিবারের সকল সদস্যকে এই কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু কারো ক্ষেত্রে এটা অন্যান্যদের তুলনায় একটু বেশি হয়। মহিলা, বৃদ্ধলোক এবং মেয়ে শিশুদেরকে পরিবারে উপলব্ধ সকল সুযোগসুবিধা থেকে নিয়মিত বঞ্চিত করা হয়ে থাকে। সুতরাং মহিলা, শিশু (বিশেষত মেয়ে শিশু) এবং বৃদ্ধ লোকেরা দরিদ্রের মধ্যে দরিদ্রতম হয়ে থাকে। নীচের বাক্সে দেখো।

শিবরমণের গল্প

শিবরমন তামিলনাড়ুর কারুর শহরের কাছে ছোটো একটি গ্রামে বসবাস করে। কারুর হস্তচালিত তাঁত এবং যন্ত্রচালিত তাঁতের কাপড়ের জন্য প্রসিদ্ধ। এই গ্রামে 100টি পরিবার বসবাস করে। শিবরমণ জাতির দিক দিয়ে একজন মুচি, এখন সে দৈনিক 50 টাকার হাজিরায় একজন কৃষিশ্রমিক। কিন্তু এই কাজ সে বছরে পাঁচ বা ছয় মাস করতে পারে। অন্য সময়ে সে শহরে অন্যান্য ছোটো খাটো কাজ করে থাকে। তার স্ত্রী শশীকলাও তার সঙ্গে কাজ করে। কিন্তু এই দিনগুলিতে সেও কখনো কখনোই কাজ পেয়ে থাকে। যদি কাজ পেয়ে থাকে তাহলে শিবরমণ যে কাজ করে থাকে সেই সমপরিমাণ কাজের জন্য সে দৈনিক 25 টাকা মজুরি পায়। পরিবারে আটজন সদস্য আছে। শিবরমণের 65 বর্ষীয় বিধবা মা প্রায়ই অসুস্থ থাকে এবং তার প্রতিদিনের কাজকর্মে

তাকে সাহায্য করার প্রয়োজন হয়। তার 25 বর্ষীয় একজন অবিবাহিত বোন আছে এবং চার সন্তান বর্তমান যাদের বয়স 1 থেকে 16 বছরের মধ্যে। তাদের মধ্যে তিনজন মেয়ে, সবচেয়ে ছোটো হল তার ছেলে। মেয়েদের মধ্যে কেউই বিদ্যালয়ে যায় না। মেয়েদের জন্য বিদ্যালয়ের বই এবং অন্যান্য সামগ্রী কেনা বিলাসিতার সমান এবং তার সামর্থ্যের বাইরে। আবার যে-কোনো দিন তাদেরকে বিয়ে দিতে হবে, সুতরাং সে তাদের পড়াশোনার জন্য কোনো টাকা খরচ করতে চায় না। তার মায়ের বাঁচার ইচ্ছা শেষ হয়ে গেছে এবং মৃত্যুর জন্য অপেক্ষা করছে। তার বোন এবং বড়ো মেয়ে ঘরের অন্যান্য কাজগুলি করে। শিবরমণ ছেলের যখন সময় (বয়স) হবে তখন তাকে বিদ্যালয়ে পাঠাতে আগ্রহী। তার অবিবাহিত বোনের সঙ্গে তার স্ত্রীর বনিবনা খুব একটা ভালো না। শশীকলা তাকে পরিবারের বোঝা মনে করে, কিন্তু শিবরমণ টাকার অভাবের কারণে তার বিয়ের জন্য কোনো ভালো পাত্র খুঁজতে পারছে না। যদিও দুই বেলা খাবারের সংস্থান করা পরিবারটির জন্য ভীষণ কষ্টসাধ্য কাজ, শিবরমণ তার একমাত্র ছেলের জন্য মাঝে মধ্যে দুধের ব্যবস্থা করতে পারে।

চলো আলোচনা করি

তোমার চারদিকে কিছু দরিদ্র পরিবার পর্যবেক্ষণ করো এবং নিম্নলিখিতগুলি খোঁজার চেষ্টা করো :-

- তারা কোন্ সামাজিক এবং অর্থনৈতিক গোষ্ঠী বা শ্রেণির অন্তর্গত ?
- পরিবারের মধ্যে উপার্জনকারী সদস্য কে বা কারা?
- পরিবারের মধ্যে বৃদ্ধ লোকেদের অবস্থা কীরূপ?
- সকল বাচ্চারা (ছেলে এবং মেয়ে) কি বিদ্যালয়ে যায়?

আন্তঃরাজ্য অসমতা

ভারতবর্ষে দরিদ্রতার অন্য একটি দৃষ্টিভঙ্গি বা দিক আছে। দরিদ্র লোকের অনুপাত প্রত্যেকটি রাজ্যের ক্ষেত্রে এক সমান নয়। যদিও সত্তর দশকের শুরু থেকে রাজ্যস্তরীয় সুদীর্ঘকালীন দরিদ্রতা ক্রমশ হ্রাস পেয়েছে, দরিদ্রতা হ্রাসের এই সফলতার হার বিভিন্ন রাজ্যের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রকম। সাম্প্রতিককালের হিসাবে, 2011-12 সালে ভারতবর্ষের দারিদ্র্যের অনুপাত (Head Count Ratio) ছিল 21.9 শতাংশ। কিছু রাজ্য যেমন মধ্যপ্রদেশ, আসাম, উত্তরপ্রদেশ, বিহার এবং ওড়িশার দরিদ্রতার অনুপাত জাতীয় অনুপাতের চেয়ে বেশি ছিল। লেখচিত্র 3.2 থেকে দেখা যায়, বিহার এবং ওড়িশা যথাক্রমে 33.7 এবং 32.6 শতাংশ দরিদ্রতার হারের সাথে দুটি সর্বাধিক দরিদ্র রাজ্য হিসেবে পরিচিত হয়েছে। ওড়িশ্যা, মধ্যপ্রদেশ, বিহার এবং উত্তরপ্রদেশ রাজ্যগুলিতে গ্রামীণ-দারিদ্র্যের সঙ্গে সঙ্গে শহুরে দারিদ্র্যের সংখ্যাও অনেক বেশি।

এগুলির তুলনায় কেরালা, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, গুজরাট এবং পশ্চিমবঙ্গে দরিদ্রতা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। পাঞ্জাব এবং হরিয়ানার মতো রাজ্য কৃষির বিকাশের উচ্চ হারের জন্য দারিদ্র্য হ্রাস করার ক্ষেত্রে ঐতিহ্যগতভাবে সফল হয়েছে। ত্রিপুরাতেও দারিদ্রসীমার নীচের মানুষের সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে। কেরালা মানব সম্পদ বিকাশের উপর গুরুত্ব দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে ভূমি সংস্কার দারিদ্র্য হ্রাসের ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে। অন্ধ্রপ্রদেশ এবং তামিলনাড়ুতে খাদ্যশস্যের সর্বজনীন বিতরণ (Public Distribution) ভালো হওয়ায় উন্নতি লাভ করেছে।

বিশ্ব দারিদ্র্যের প্রেক্ষাপট

উন্নয়নশীল দেশগুলিতে আর্থিক দিক দিয়ে অত্যন্ত দারিদ্র্য (বিশ্বব্যাংকের পরিভাষা অনুযায়ী দৈনিক 1.9 ডলারের চেয়ে কম খরচে যাদের জীবিকা নির্বাহ হয়) বসবাসকারী লোকের অনুপাত 1990 সালে যেখানে 35 শতাংশ ছিল সেটা 2013 সালে কমে গিয়ে 10.68 শতাংশে দাঁড়িয়েছে। যদিও বিশ্বব্যাপী দারিদ্র্য উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে, কিন্তু এর ফলে বৃহত্তম আঞ্চলিক বৈষম্য লক্ষ করা গেছে। তীব্র অর্থনৈতিক বিকাশ এবং মানব সম্পদ উন্নয়নে বৃহৎ বিনিয়োগের ফলস্বরূপ চিন এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে দারিদ্র্য উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে। চিনে দরিদ্র লোকের সংখ্যা 1981 সালের 88.3 শতাংশ থেকে কমে গিয়ে 2008 সালে 14.7 শতাংশ এসে দাঁড়িয়েছে এবং পরে সেটা আরও কমে গিয়ে 2013 সালে 1.9 শতাংশে পৌঁছেছে। দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলিতেও (ভারত, পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, বাংলাদেশ, ভুটান) দরিদ্র লোকের সংখ্যা 54 শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে 15 শতাংশে পৌঁছেছে। দরিদ্রের শতকরা হার হ্রাস পাওয়ার ফলে দরিদ্র লোকের সংখ্যাও উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে যেখানে 1990 সালে 44 শতাংশ ছিল সেটা 2013 সালে 17 শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে। বিভিন্ন দারিদ্র্যরেখার

লেখচিত্র 3.2 ঃ ভারতের কিছু রাজ্যের দারিদ্র্যের অনুপাত, 2015-16

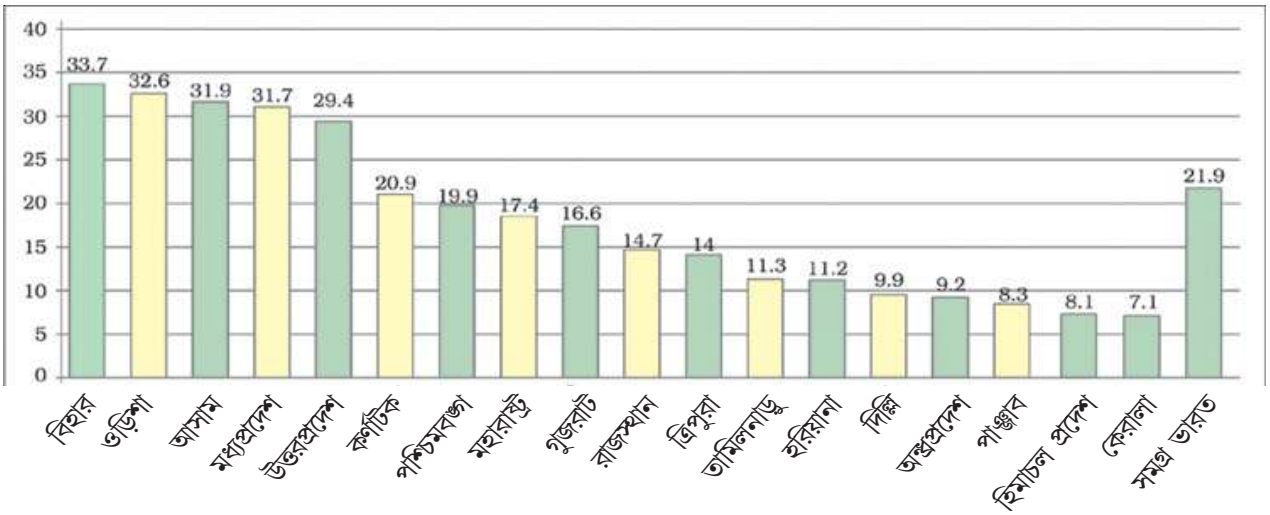

উৎস: Economic Survey 2015–16, Ministry of Finance, Government of India

চলো আলোচনা করি

লেখচিত্র 3.2 পর্যবেক্ষণ করো এবং নিম্নলিখিতগুলি করে দেখাও :-

- তিনটি রাজ্য চিহ্নিত করো যেখানে দারিদ্র্যের অনুপাত সবচেয়ে বেশি।
- তিনটি রাজ্য চিহ্নিত করো যেখানে দারিদ্র্যের অনুপাত সবচেয়ে কম।

দারিদ্র্যরেখার পরিভাষার কারণে ভারতবর্ষেও দারিদ্র্য জাতীয় পরিমাপের চেয়ে বেশি দেখা যায়।

উপ-সাহারা আফ্রিকায় দারিদ্র্য 1990 সালের 54 শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে 2013 সালে 41 শতাংশে এসে দাঁড়িয়েছে (লেখচিত্র 3.3 দেখো)। লাতিন আমেরিকাতেও দারিদ্র্যের অনুপাত 1990 সালের 16 শতাংশ থেকে হ্রাস পেয়ে 2013 সালে 5.4 শতাংশে পৌঁছেছে। (লেখচিত্র 3.3 দেখো) রাশিয়ার মতো কিছু পূর্ব-সমাজতন্ত্রী দেশে পুনরায় দারিদ্র্য প্রতীয়মান হচ্ছে, যেখানে সরকারিভাবে আগে কখনও দারিদ্র্যের অস্তিত্ব ছিল না। সারণি 3.2 থেকে দেখা যায়, আন্তর্জাতিক দারিদ্র্যরেখার (অর্থাৎ জনসংখ্যা যাদের আয় দৈনিক 1.90 ডলারের চেয়ে কম) সংজ্ঞা অনুযায়ী বিভিন্ন দেশের দারিদ্র্য রেখার নীচে বসবাসকারী দরিদ্র লোকের অনুপাত। সম্মিলিত জাতিপুঞ্জের (United Nations) স্থিতিশীল উন্নয়নের মূল লক্ষ্য হল 2030 সালের মধ্যে দারিদ্র্যের বিলুপ্তি ঘটানো।

চলো আলোচনা করি

লেখচিত্র 3.4 পর্যবেক্ষণ করো এবং নিম্নলিখিতগুলি করে দেখাও :-

- বিশ্বের সেইসব স্থানগুলি চিহ্নিত করো যেখানে দারিদ্র্যের অনুপাত কমেছে।
- বিশ্বের সেইসব স্থানগুলি চিহ্নিত করো যেখানে দরিদ্র লোকের সংখ্যা সর্বাধিক।

সারণি 3.2 ঃ দারিদ্র্য : কিছু দেশের মধ্যে তুলনা

দেশ	দৈনিক 1.90 ডলারের নীচে জনসংখ্যার হার
1. নাইজেরিয়া	53.5 (2009)
2. বাংলাদেশ	18.5 (2010)
3. ভারত	21.2 (2011)
4. পাকিস্তান	6.1 (2013)
5. চিন	1.9 (2013)
6. ব্রাজিল	3.7 (2014)
7. ইন্দোনেশিয়া	8.3 (2014)
8. শ্রীলঙ্কা	1.9 (2012)

উৎস : Poverty & Equity Database, World Bank Data; (databank.worldbank.org)

লেখচিত্র 3.3 ঃ প্রতিদিন 1.9 ডলারে জীবনযাপন করা লোকের হার, 1990-2013

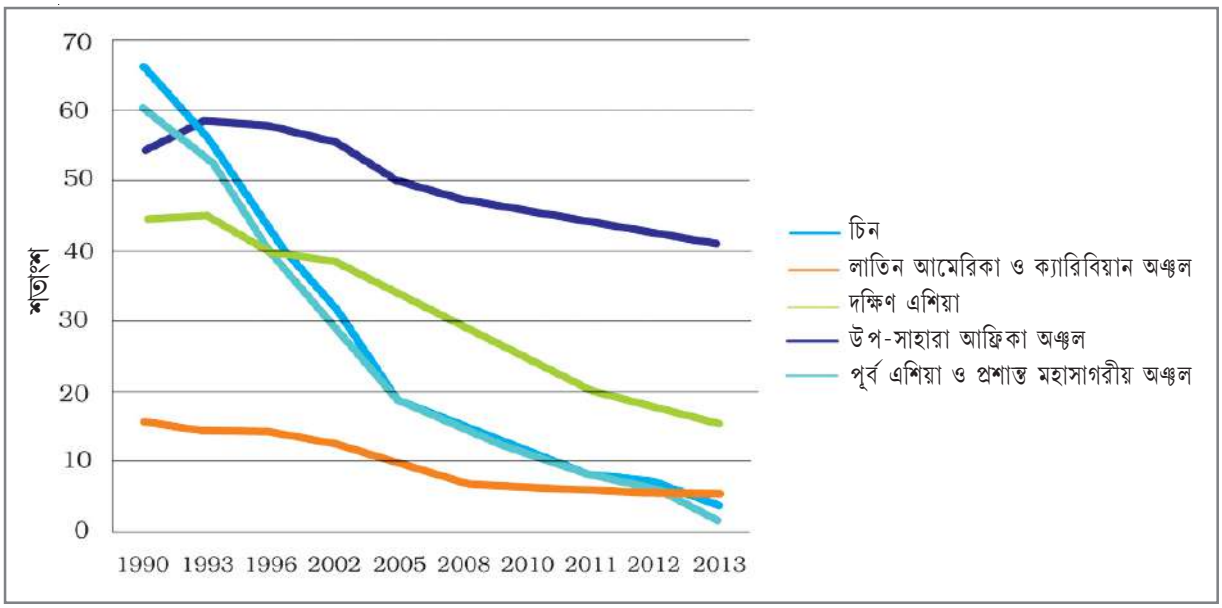

উৎস : Poverty and Equity Database; World Bank
(http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=poverty-and-equity-database)

লেখচিত্র 3.4 : অঞ্চলভিত্তিক দরিদ্রের সংখ্যা ($1.90 প্রতিদিন) মিলিয়নে

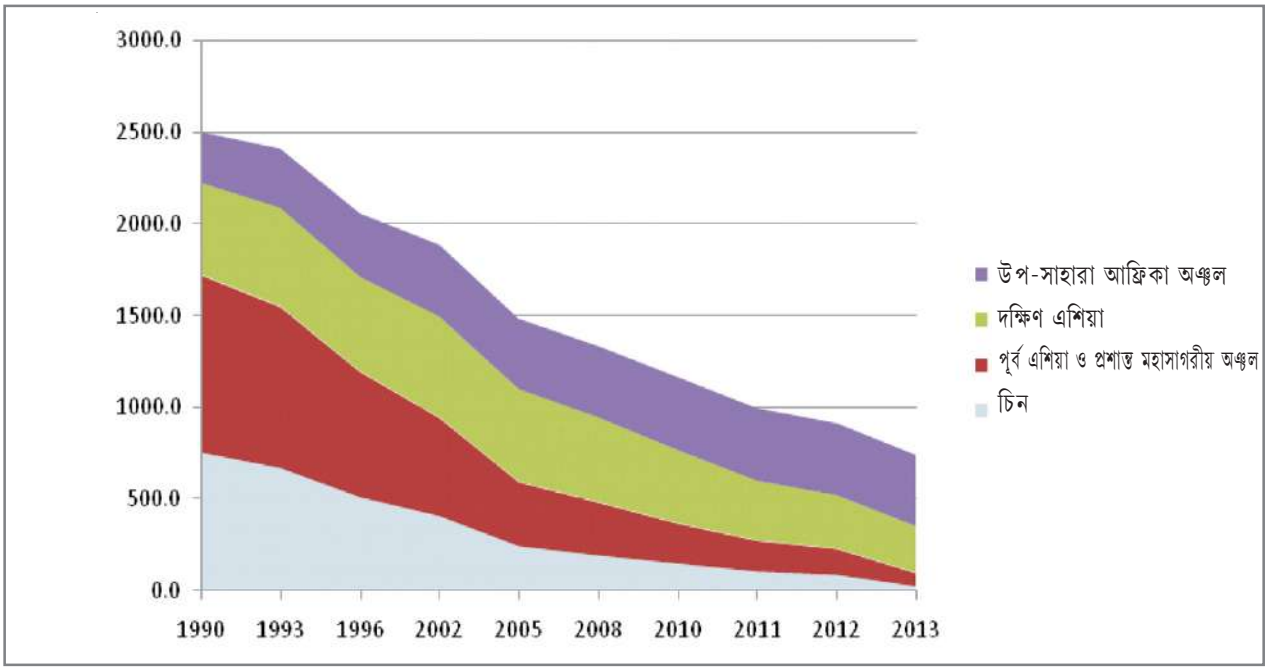

উৎস : Poverty and Equity Database; World Bank
(http://databank.worldbank.org/data/reports.aspx?source=poverty-and-equity-database)

দারিদ্র্যের কারণ

ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে বিস্তৃত দারিদ্র্যের অনেকগুলি কারণ আছে। এর মধ্যে একটি ঐতিহাসিক কারণ হল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক প্রশাসনের সময় অর্থনৈতিক বিকাশের নিম্নস্তর হওয়া। ওপনিবেশিক সরকারের নীতিগুলি ঐতিহ্যবাহী হস্তশিল্পগুলিকে ধ্বংস করে দিয়েছে এবং বস্ত্রশিল্পের মতো শিল্পগুলিকে নিরুৎসাহ প্রদান করেছে। অর্থনৈতিক বিকাশের হার 1980-এর দশক পর্যন্ত স্থির ছিল। এর ফলস্বরূপ কর্মসংস্থানের সুযোগ হ্রাস পেয়েছে এবং আয় বৃদ্ধির হার কমে গেছে। এর সঙ্গে জনসংখ্যা উচ্চ হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই দুইটি একত্রে মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধির হার অনেকটা কমিয়ে দিয়েছে। অর্থনৈতিক বিকাশের বৃদ্ধি এবং জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, এই দুই ক্ষেত্রে অসফলতা দারিদ্র্য চক্রকে চিরস্থায়ী করেছে। উন্নত সেচব্যবস্থা এবং সবুজ বিপ্লবের ফলে, কৃষিক্ষেত্রে অনেক কর্মসংস্থানের সৃষ্টি হয়েছে। কিন্তু এর প্রভাব ভারতবর্ষের কিছু অংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। সরকারি এবং বেসরকারি উভয় প্রকারের শিল্প কিছু কর্মসংস্থানের সুযোগ দিয়েছে। কিন্তু এগুলি সকল কর্মপ্রার্থীদের (Job seekers) জন্য যথেষ্ট পরিমাণ ছিল না। শহরে উপযুক্ত কাজের অভাবে অনেক লোক রিকশা চালক, বিক্রেতা, গৃহ নির্মাণ শ্রমিক, বাড়ির কাজের লোক ইত্যাদি হিসাবে কাজ করতে শুরু করল। অনিয়মিত এবং স্বল্প আয়ের কারণে এই লোকগুলি দামি বাড়িতে বাস করতে পারল না। তারা শহরের বাইরে বস্তিতে বাস করতে শুরু করল এবং দারিদ্র্যের সমস্যাগুলি, যা প্রধানত একটি গ্রামীণ এলাকার ঘটনা, শহরাঞ্চলের বৈশিষ্ট্য হিসাবে প্রকাশ পেল।

দারিদ্র্যের উচ্চহারের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল আয়ের ক্ষেত্রে অসাম্য। এর একটি প্রধান কারণ হল ভূমি এবং অন্যান্য সম্পদের অসম বন্টন। অনেক নীতি থাকা সত্ত্বেও, আমরা সার্থকভাবে এই বিষয়টির মোকাবিলা করতে পারিনি। বিভিন্ন নীতির প্রবর্তন যেমন ভূমি সংস্কার যার লক্ষ্য ছিল গ্রামীণ এলাকায় সম্পত্তির পুনর্বণ্টন ব্যবস্থা যা সঠিকভাবে প্রয়োগ করা হয়নি এবং অধিকাংশ রাজ্য সরকার সেটাকে ফলপ্রসু করে তোলেনি। যেহেতু ভূমি সম্পদের অভাব ভারতবর্ষে দারিদ্র্যের একটি অন্যতম প্রধান কারণ, এই নীতির যথাযথভাবে কার্যকর হওয়া লক্ষ লক্ষ গ্রামীণ দরিদ্র্য লোকের জীবনে উন্নতি ঘটাতে পারত।

আরও অনেক সামাজিক-সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক উপাদানগুলিও দারিদ্র্যের জন্য দায়ী। ভারতবর্ষের লোকেরা এমনকি খুব দরিদ্র লোক, সামাজিক দায়িত্ব পালন এবং ধার্মিক অনুষ্ঠান করার জন্য প্রচুর টাকা ব্যয় করে থাকে। ছোটো কৃষকদের বীজ, সার, কীটনাশক ইত্যাদির মতো কৃষিজ উপাদানগুলি কেনার জন্য টাকার প্রয়োজন হয়। যেহেতু দরিদ্র লোকের সঞ্চয় খুবই সামান্য হয়, সুতরাং তারা ধার করে। দারিদ্র্যের কারণে ধার শোধ করতে অসমর্থ হওয়ার ফলে তারা ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং, অত্যধিক ঋণগ্রস্ততা দারিদ্র্যের কারণ ও ফল উভয়ই হয়।

দারিদ্র্য দূরীকরণের উপায়

দারিদ্র্য নির্মূল করা ভারতবর্ষের উন্নয়ন পরিকল্পনার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য। সরকারের বর্তমান দারিদ্র্য দূরীকরণ পরিকল্পনা সাধারণভাবে দুই দফার উপর নির্ভরশীল — (1) অর্থনৈতিক বিকাশে জোর দেওয়া এবং (2) দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি বাস্তবায়িত করা। আশির দশকের শুরু থেকে শেষ ত্রিশ বছরে মাথাপিছু আয়ের বৃদ্ধি খুবই সামান্য ছিল এবং দারিদ্র্য সেভাবে হ্রাস পায়নি। 1950 দশকের শুরুতে সরকারিভাবে — দারিদ্র্যের হিসাব ছিল 45 শতাংশ সেটা 1980-দশকের শুরুতেও মোটামুটিভাবে একই রয়ে গেছে। 1980-এর দশক থেকে ভারতের অর্থনৈতিক বিকাশের হার বিশ্বের মধ্যে বেশি ছিল। বিকাশের হার 1970 দশকের প্রায় 3.5 শতাংশ থেকে লাফ দিয়ে 1980 এবং 1990 দশকে 6 শতাংশের কাছে পৌঁছে গেছে। বিকাশের এই উচ্চহার অভূতপূর্বভাবে দারিদ্র্য কমাতে সাহায্য করেছে। সুতরাং, এটা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে অর্থনৈতিক বিকাশ এবং দারিদ্র্য নির্মূলের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। অর্থনৈতিক বিকাশ সুযোগসুবিধাগুলিকে প্রসারিত করে এবং মানব উন্নয়নে বিনিয়োগ করার জন্য অত্যাবশ্যকীয় সম্পদের যোগান দেয়। এটা শিক্ষায় বিনিয়োগের ফলে অধিক আর্থিক প্রতিদানের আশায় বাচ্চাদের এমনকি মেয়েদেরও বিদ্যালয়ে পাঠাতে লোকেদের উৎসাহিত করে। তথাপি দরিদ্র লোকেরা অর্থনৈতিক বিকাশের দ্বারা সৃষ্ট সুযোগগুলি থেকে প্রত্যক্ষ সুবিধা নিতে পারে না। আরও বলতে গেলে কৃষিক্ষেত্রের বিকাশ আশানুরূপভাবে

ঘটেনি। দারিদ্র্যের উপর এর প্রত্যক্ষ প্রভাব পড়েছে কেন না দরিদ্র লোকেদের একটা বড়ো অংশ গ্রামে বাস করে এবং তারা কৃষির উপর নির্ভরশীল হয়।

এইসব পরিস্থিতির কারণে দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়েছে। যদিও এমন অনেক যোজনা আছে যেগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দারিদ্র্য দূর করার জন্য তৈরি হয়েছে, এগুলির মধ্যে কয়েকটির উল্লেখ করা খুবই দরকার। Mahatma Gandhi National Rural Employment Gurantee Act, 2005 (MGNREGA)-যার উদ্দেশ্য গ্রামীণ এলাকায় জীবনজীবিকা সুরক্ষিত করতে প্রতি ঘরে 100 দিনের কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করা এবং বিনিময়ে মজুরি প্রদান করা। এর আরেকটি উদ্দেশ্য হল স্থিতিশীল উন্নয়ন (Sustainable Development) ঘটানো যার মাধ্যমে খরা, বন ধ্বংস এবং মাটি ধ্বসের কারণগুলি অবলুপ্ত হয়। এই কর্মসূচিতে এক-তৃতীয়াংশ কর্মসংস্থান মহিলাদের জন্য সুরক্ষিত রাখা হয়েছে। এই স্কিমে 4.78 কোটি পরিবারকে 220 কোটি শ্রমদিবসের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের সুযোগ দেয়া হয়েছে। তপশিলি জাতি (SC), তপশিলি উপজাতি (ST) এবং মহিলাদের এই শ্রমদিবসের অংশ হল যথাক্রমে 23 শতাংশ, 17 শতাংশ ও 53 শতাংশ। গড় মজুরি যেটা 2006-07 সালে 65 টাকা ছিল সেটা 2013-14 সালে বৃদ্ধি পেয়ে 132 টাকা হয়েছে।

Prime Minister Rozger Yozana (PMRY)-হল আরেকটি যোজনা যেটা 1993 সালে শুরু হয়েছিল। এই যোজনার মূল উদ্দেশ্য হল গ্রামীণ এলাকা এবং শহর অঞ্চলের শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতিদেরকে কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে স্ব-নির্ভর করে তোলার সুযোগ প্রদান করা। তাদেরকে ছোটো ব্যবসা বা ছোটো শিল্প গড়তে সাহায্য করা।

Rural Employment Generation Programme (REGP)-1995 সালে শুরু হয়েছিল। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ এলাকা এবং ছোটো শহরে স্ব-রোজগারের সুযোগ সৃষ্টি করা। দশম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনাকালে এই কর্মসূচির আওতায় 25 লাখ নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছিল।

Swarnajayanti Gram Swarozgar Yojana (SGSY) - শুরু হয়েছিল 1999 সালে। এই কর্মসূচির উদ্দেশ্য ছিল দরিদ্র পরিবারগুলিকে স্ব-সহায়ক গোষ্ঠীর (Self help group) মাধ্যমে সংগঠিত করে ব্যাংকের মাধ্যমে ঋণ প্রদান এবং সরকারি ভর্তুকি দিয়ে তাদেরকে দারিদ্র্যরেখার উপরে তুলে আনা।

Pradhan Mantri Gramodaya Yozana (PMGY) শুরু হয়েছিল 2000 সালে। এই কর্মসূচির মাধ্যমে প্রাথমিক স্বাস্থ্য, প্রাথমিক শিক্ষা, গ্রামীণ আশ্রয়, গ্রামীণ পানীয় জল এবং গ্রামীণ বিদ্যুতের মতো মূল সুবিধাগুলির জন্য রাজ্যগুলিকে অতিরিক্ত কেন্দ্রীয় সাহায্য প্রদান করা।

Antyodaya Anna Yozana (AAY) -হল আরেকটি গুরুত্বপূণ কর্মসূচি যার সম্বন্ধে তোমরা পরবর্তী অধ্যায়ে অধ্যয়ন করবে।

এই কর্মসূচিগুলির মিশ্রফল পরিলক্ষিত হয়েছে। এগুলির প্রভাব কম হওয়ার একটি মুখ্য কারণ ছিল সঠিক বাস্তবায়ন এবং লক্ষ্য সুনিশ্চিত করার অভাব। এর বাইরে বলতে গেলে কিছু কর্মসূচি ছিল পরস্পরকে অতিক্রমন (Overlapping) করার ফল। ভালো চিন্তাধারা থাকা সত্ত্বেও এই কর্মসূচিগুলির সুফল বা লাভ পুরোপুরিভাবে যেসব দরিদ্র্য লোক পাওয়ার যোগ্য তাদের কাছে পৌঁছায়নি। সুতরাং, সাম্প্রতিক বছরগুলিতে এইসব দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচিগুলির সঠিক বাস্তবায়ন এবং সেই সঙ্গে সঠিক পর্যবেক্ষণর উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

ভবিষ্যতের সমস্যাগুলি

ভারতের দারিদ্র্য নিশ্চিতভাবে হ্রাস পেয়েছে। কিন্তু উন্নতি সত্ত্বেও, দারিদ্র্য হ্রাস করা ভারতবর্ষে একটি কঠিন চ্যালেঞ্জ। বিভিন্ন রাজ্যের গ্রামীণ এবং শহরাঞ্চলের দারিদ্র্যে ব্যাপকভাবে অসাম্য দেখা যায়। কিছু সামাজিক এবং অর্থনৈতিক বর্গ দারিদ্র্যের প্রতি খুবই অসুরক্ষিত। আশা করা যায়, দারিদ্র্য হ্রাসের ব্যাপারে আগামী 10 থেকে 15 বছরের মধ্যে ভালোই উন্নয়ন ঘটবে। এটা সম্ভব হবে মূলত উচ্চ অর্থনৈতিক বিকাশ, সর্বজনীন অবৈতনিক প্রাথমিক শিক্ষায় জোর, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, মহিলা এবং সমাজের অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণির ক্ষমতায়নে জোর দেওয়া হলে।

সরকারিভাবে দারিদ্র্যের সংজ্ঞা হল, যেখানে লোকেদের জন্য দারিদ্র্য বলতে সত্যিকারের একটি অংশের মধ্যেই সীমিত থাকে। এটি হল জীবন জীবিকা নির্বাহ করার জন্য উচিত স্তর অপেক্ষা

জীবনজীবিকা নির্বাহের ন্যূনতম স্তরে থাকা। অনেক বুদ্ধিজীবীরা এর সমর্থনে বলেছেন যে, দারিদ্র্যের বিস্তারিত ধারণাটা 'মানব দারিদ্র্যে' সীমিত থাকা দরকার। হতে পারে একটা বিশাল অংশের মানুষ তাদের নিজের খাবারের বন্দোবস্ত করতে সামর্থ্য আছে কিন্তু তার কাছে কি শিক্ষা আছে? বা আশ্রয় আছে? বা স্বাস্থ্য সুরক্ষা আছে? বা চাকুরির নিশ্চয়তা আছে? বা আত্মবিশ্বাস আছে? তারা কি জাতি এবং লিঙ্গ বৈষম্য থেকে মুক্ত আছে? শিশু শ্রমের প্রথা কি চালু আছে? বিশ্বব্যাপী অভিজ্ঞতার নিরিখে বলা যায় উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে দারিদ্র্যের সংজ্ঞাও পরিবর্তিত হয়। দারিদ্র্য নির্মূলীকরণ সবসময় একটি গতিশীল প্রক্রিয়া বা লক্ষ্য। আশা করা যায় আগামী দশকের শেষদিকে আমরা সবাইকে কেবল আয়ের পরিপ্রেক্ষিতে ন্যূনতম আবশ্যক আয় উপলব্ধ করাতে পারব। কিন্তু আমাদের মূল লক্ষ্য হবে অনেকগুলি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ যেগুলি এখনও বর্তমান অর্থাৎ স্বাস্থ্য পরিসেবা প্রদান, সবার জন্য শিক্ষা এবং কর্মসংস্থান সুনিশ্চিত করা, লিঙ্গ সমতা এবং দরিদ্রদের সম্মান প্রদান করা। এগুলি আরও অনেক বড়ো কাজ হবে।

সারাংশ

তোমরা এই অধ্যায়ে দেখেছ যে দারিদ্র্যের অনেক দিক বা মাত্রা আছে। সাধারণত, এটি 'দারিদ্র্যরেখা'-র ধারণার সাহায্যে মাপা হয়। এই ধারণার সাহায্যে আমরা মূলত বিশ্ব এবং জাতীয় স্তরের দারিদ্র্যের গতি প্রকৃতির বিশ্লেষণ করেছি। কিন্তু সাময়িককালে দারিদ্র্যের বিশ্লেষণ 'সামাজিক বহিষ্কার' (Social Exclusion) -এর মতো অনেক নতুন ধারণার সাহায্যে সমৃদ্ধ হয়েছে। একইভাবে চ্যালেঞ্জগুলিও বেড়ে গেছে, কেননা বুদ্ধিজীবীরা 'মানব দারিদ্র্য' (Human Poverty)-র ধারণাকে বিস্তৃত করেছেন।

অনুশীলনী

1. ভারতবর্ষে দারিদ্র্যরেখার হিসেব কীভাবে করা হয়?
2. তুমি কি মনে কর যে, দারিদ্র্য পরিমাপ করার বর্তমান পদ্ধতিটি সঠিক?
3. ভারতবর্ষে 1973 সাল থেকে দারিদ্র্যের ধরনগুলি আলোচনা করো।
4. ভারতবর্ষে দারিদ্র্যের মুখ্য কারণগুলি আলোচনা করো।
5. সেইসব সামাজিক এবং অর্থনৈতিক গোষ্ঠী বা বর্গসমূহকে চিহ্নিত করো যেগুলি ভারতবর্ষে দারিদ্র্যের সামনে খুবই অসুরক্ষিত।
6. ভারতবর্ষে দারিদ্র্যের আন্তঃরাজ্য অসমতা বা বিভেদের একটি সুস্পষ্ট ধারণা দাও।
7. বিশ্ব দারিদ্র্যের ধরনের বর্ণনা দাও।
8. দারিদ্র্য দূরীকরণে সরকারের বর্তমান কর্মসূচিগুলি আলোচনা করো।
9. সংক্ষেপে নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও।
   (i) মানব দারিদ্র্য বলতে কী বোঝ?
   (ii) দরিদ্রের মধ্যে দরিদ্রতম কারা?
   (iii) National Rural Employment Guarantee Act 2005-এর মূল বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

References

Deaton, Angus and Valerie Kozel (Eds.) 2005. *The Great Indian Poverty Debate*. MacMillan India Limited, New Delhi.

Economic Survey 2015–2016. Ministry of Finance, Government of India, New Delhi. (Chapter on social sectors, [Online web] URL: http://indiabudget.nic.in/es_2004–05/social.htm)

Mid-Term Appraisal of the Tenth Five Year Plan 2002–2007. Planning Commission, New Delhi. Part II, Chapter 7: Poverty Elimination and Rural Employment, [Online web] URL: http://www.planningcommission.nic.in/midterm/english-pdf/chapter-07.pdf

National Rural Employment Guarantee Act 2005. [Online web] URL: http://rural.nic.in/rajaswa.pdf

Panagriya Arvind and Vishal More *'Poverty by social, religious and economic groups in India and its largest state'*, working paper no. 2013-14, Programme on Indian economic policies, Columbia University.

Tenth Five Year Plan 2002–2007. Planning Commission, New Delhi. (Chapter 3.2, Poverty Alleviation in Rural India: Strategy and Programmes, [Online web] URL: http://www.planningcommission.nic.in/plans/planrel/fiveyr/10th/volume2/v2_ch3_2.pdf

World Development Indicators 2016. Featuring the Suistainable Development Goals, The World Bank.

৪ অধ্যায়

ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা

সংক্ষিপ্ত বিবরণ

- খাদ্য নিরাপত্তা বলতে বোঝায় সমস্ত জনগণের সর্বসময়ের জন্য খাদ্যের প্রাপ্তি, সহজলভ্যতা এবং ক্রয় সামর্থ্য। খাদ্যশস্যের উৎপাদন ও বণ্টনে সমস্যা সৃষ্টি হলে দরিদ্র জনগণের আরও খাদ্য নিরাপত্তার সমস্যা সৃষ্টি হয়। খাদ্য নিরাপত্তা নির্ভর করে গণবণ্টন ব্যবস্থার উপর এবং সঠিক সরকারি নজরদারি ও সময়মত গৃহীত পদক্ষেপের উপর, যখন তা হুমকির মুখে পড়ে।

খাদ্য নিরাপত্তা কী ?

শ্বাসপ্রশ্বাসের জন্য যেমন বায়ুর প্রয়োজন তেমনি বেঁচে থাকার জন্য খাদ্য খুবই প্রয়োজনীয়। কিন্তু খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি দুবেলা দুমুঠো খাদ্য সংস্থানের চেয়ে অনেক বড়ো ব্যাপার। খাদ্য নিরাপত্তার নিম্নলিখিত দিকগুলি রয়েছে —

(a) *খাদ্যের লভ্যতা বা প্রাপ্তি* (Availability) হল দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদন, আমদানিকৃত খাদ্যদ্রব্য ও সরকারি শস্যাগারে গত বছরের মজুতের সমষ্টি।

(b) *সহজলভ্যতা* (Accessibility) হল দেশের সকল মানুষের কাছে খাদ্যদ্রব্য সহজলভ্য হওয়া।

(c) *ক্রয় ক্ষমতা* (Affordability) বলতে বোঝায় বেঁচে থাকতে যে পরিমাণ ন্যূনতম, নিরাপদ ও পুষ্টিকর খাদ্যের প্রয়োজন তার জন্য ব্যক্তির নিকট যথেষ্ট অর্থের সংস্থান।

তাই দেশে খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত তখনই হবে যদি — (1) সবার জন্য পর্যাপ্ত খাদ্যের সংস্থান থাকবে, (2) সবার প্রয়োজনীয় গুণগত খাদ্যের ক্রয়ক্ষমতা থাকবে, (3) খাদ্যের সহজলভ্যতায় কোনো বাধা থাকবে না।

কেন খাদ্য নিরাপত্তা প্রয়োজন?

যখন দেশে হঠাৎ কোনো প্রাকৃতিক দুর্যোগ ঘটে যেমন ভূমিকম্প, খরা, বন্যা, সুনামি, শস্যহানির জন্য দুর্ভিক্ষ তখন যারা দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে, এমনকি যারা দারিদ্র্যসীমার উপরে রয়েছে তারাও খাদ্য অসুরক্ষার সম্মুখীন হয়ে পড়তে পারে। **দুর্যোগ কীভাবে খাদ্য নিরাপত্তাকে প্রভাবিত করে?** প্রাকৃতিক দুর্যোগে, যেমন খরা, খাদ্যশস্যের মোট উৎপাদন হ্রাস পায়। ফলে প্রভাবিত এলাকায় খাদ্যের যোগানে ঘাটতি দেখা দেয়। খাদ্যশস্যের ঘাটতির কারণে মূল্যবৃদ্ধি ঘটে। দামবৃদ্ধির কারণে কিছু লোক খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করতে অক্ষম হয়। এই ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগ যদি বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে হয় বা দীর্ঘ সময়ব্যাপী হয়, তবে তা অনাহারের (starvation) সৃষ্টি করে। দীর্ঘ সময়ের এই খাদ্যহীনতা বা অনাহার দুর্ভিক্ষ ডেকে আনতে পারে।

দুর্ভিক্ষে অসংখ্য লোকের মৃত্যু ঘটে অনাহারে এবং দূষিত জল ব্যবহারে বাধ্যবাধকতা পচা খাদ্য খেয়ে মহামারিতে এবং

1970 এর দশকে খাদ্য নিরাপত্তা বলতে বোঝাত "সর্বসময়ের জন্য ন্যূনতম খাদ্যশস্যের যথেষ্ট যোগান" (UN, 1975) অমর্ত্য সেন খাদ্য নিরাপত্তার সাথে একটি নতুন দিক যোগ করেন এবং খাদ্যের 'সহজলভ্যতা' (Access) এর উপর জোর দেন, যাকে তিনি বলেন খাদ্যের "Entitlements"- একজন যা উৎপাদন করে এবং রাষ্ট্রের বা অন্যান্য সামাজিকভাবে উৎপাদিত দ্রব্যের বাজারে সরবরাহের বিনিময়ের সমষ্টি। সেই অনুসারে, খাদ্য সুরক্ষার বিষয়টির একটি বাস্তবিক পরিবর্তন ঘটেছে। 1955 সালে "বিশ্ব খাদ্য শীর্ষ" (World Food Summit) সম্মেলনে ঘোষণা করা হয় যে, — "খাদ্য সুরক্ষা হল ব্যক্তিগত, পারিবারিক, আঞ্চলিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তঃরাষ্ট্রীয় স্তরে যখন সকলে সবসময় অর্থনৈতিকভাবে কার্যত যথেষ্ট পরিমাণে নিরাপদ, সুষম, পুষ্টিকর খাদ্য পায়, যাতে তারা সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে" (FAO, 1996, P.3)। উপরন্তু এই ঘোষণা আরও উপলব্ধি করে যে — "খাদ্যের সহজলভ্যতার উন্নতির জন্য দারিদ্র্য দূরীকরণ অবশ্যই প্রয়োজন।"

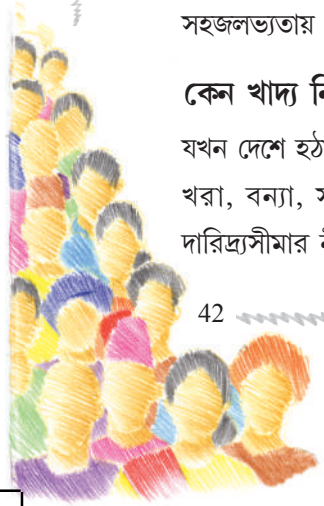

অনাহারের ফলে দেহের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা লোপ পাওয়ার জন্য।

আমাদের ভারতবর্ষে সবচেয়ে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষটি ঘটেছিল 1943 সালে যা হল 'বাংলার দুর্ভিক্ষ'। এই দুর্ভিক্ষে ত্রিশ (30) লক্ষ লোকের মৃত্যু ঘটেছিল বাংলা প্রদেশে।

তোমরা কি জান দুর্ভিক্ষে কারা বেশি আক্রান্ত হয়েছিল? নাটকীয়ভাবে চালের মূল্যবৃদ্ধির কারণে কৃষিশ্রমিক, মৎসজীবী, পরিবহণ শ্রমিক ও অন্যান্য অস্থায়ী শ্রমিকরা বেশি আক্রান্ত হয়েছিল। দুর্ভিক্ষে যারা মারা গিয়েছিল তারা ছিল তাদেরই একজন।

সারণি 4.1 : বাংলা প্রদেশে ধানের উৎপাদন

বছর	উৎপাদন (লক্ষ টন)	আমদানি (লক্ষ টন)	রপ্তানি (লক্ষ টন)	মোট সংস্থান (লক্ষ টন)
1938	85	–	–	85
1939	79	04	–	83
1940	82	03	–	85
1941	68	02	–	70
1942	93	–	01	92
1943	76	03	–	79

উৎস : Sen, A.K, 1981 Page 61

চলো আলোচনা করি

1. কিছু লোক বলে যে বাংলার দুর্ভিক্ষ হয়েছিল চালের ঘাটতির জন্য। উপরের সারণিটি অধ্যয়ন করো এবং তুমি কি এই বক্তব্যের সাথে সহমত পোষণ কর?
2. কোন্ বছরটি খাদ্যের লভ্যতা / প্রাপ্তির ক্ষেত্রে শোচনীয় পতন দেখায়?

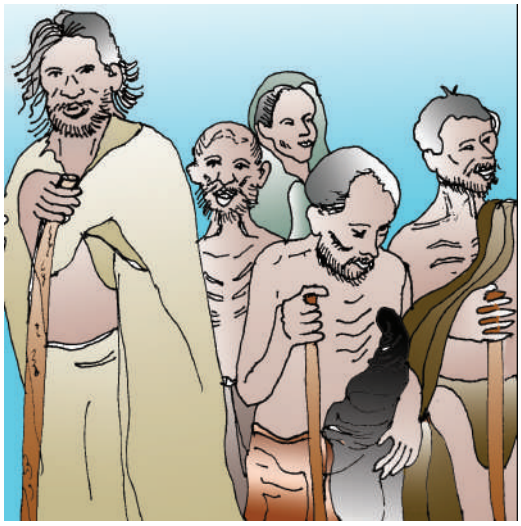

চিত্র 4.1 *দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত ত্রাণশিবিরে আগত জনগণ, 1945*

চিত্র 4.2 *1943 সালে বাংলার দুর্ভিক্ষের সময় চিটাগাং জেলার একটি পরিবার গ্রাম ছেড়ে চলে যাচ্ছে।*

প্রস্তাবিত কার্যক্রম :-

(a) 4.1 নং চিত্রে তুমি কী দেখতে পাচ্ছ?
(b) প্রথম চিত্রে কোন্ বয়সের লোকদের দেখা যাচ্ছে?
(c) তুমি কি বলতে পারো যে 4.1 নং চিত্রে দেখানো পরিবারটি একটি গরিব পরিবার? কেন ?
(d) তুমি কি ধারণা করতে পারো দুর্ভিক্ষের পূর্বে ওই লোকগুলির (উভয় চিত্রে) জীবিকার উৎস কী ছিল? (একটি গ্রামের প্রেক্ষাপটে)
(e) ত্রাণশিবিরে (Relief Camp) প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার ওইসব লোকদের কী ধরনের সাহায্য দেওয়া হয় — নির্ণয় করো।
(f) তুমি কি কখনও এরূপ আক্রান্তদের (Victim) সাহায্য করেছ (অর্থ, খাদ্য, বস্ত্র, ঔষধ ইত্যাদি দিয়ে)?

প্রকল্প : ভারতের দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে আরও তথ্য সংগ্রহ করো।

বাংলার দুর্ভিক্ষের মতো ভারতে পুনরায় আর কখনও এমন ঘটেনি। কিন্তু এটা দুর্ভাগ্যজনক যে আজকের দিনেও ওড়িশার কালাহান্ডি এবং কাশিপুরে দীর্ঘ সময় ধরে দুর্ভিক্ষের অনুরূপ পরিস্থিতি বিরাজ করছে এবং সেখানে অনাহারে মৃত্যুর খবরও পাওয়া যাচ্ছে। বিগত বছরগুলিতে রাজস্থানের বারন জেলা, ঝাড়খণ্ডের পালামৌ জেলা ও অন্যান্য প্রত্যন্ত অঞ্চলে অনাহারে মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। তাই সবসময়ের জন্য দেশে খাদ্য নিরাপত্তার প্রয়োজন।

কারা খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছে ?

যদিও ভারতে বিরাট অংশের জনগণ খাদ্য ও পুষ্টির নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছে, এর মধ্যে সবচেয়ে খারাপভাবে প্রভাবিত হচ্ছে ভূমিহীন জনগণ যাদের স্বল্প জমি রয়েছে বা নির্ভর করার মতো জমি নেই, চিরাচরিত কারিগর, চিরাচরিত সেবা (Service) প্রদানকারী, স্বল্প স্বরোজগারি শ্রমিক, ভিক্ষুকের মতো নিঃস্ব জনগণ। শহরাঞ্চলে খাদ্য নিরাপত্তাহীন পরিবারগুলি হচ্ছে যাদের পরিবারের সদস্যরা কম মজুরির পেশায় এবং অস্থায়ী শ্রমিক হিসাবে কর্মক্ষেত্রে নিয়োজিত রয়েছে। এই শ্রমিকরা মূলত মরশুমি কাজকর্মে নিযুক্ত রয়েছে এবং তাদের খুবই স্বল্প মজুরি প্রদান করা হয় যার দ্বারা তারা কোনোক্রমে জীবনধারণ করে।

রামুর গল্প

রায়পুর গ্রামে রামু একজন অস্থায়ী কৃষিশ্রমিক হিসাবে কাজ করে। তার দশ বছর বয়সের বড়ো ছেলে সমু যে একজন গোপালক (Pali) হিসাবে গ্রামে গ্রামপ্রধান সতপাল সিং-এর গবাদি পশু দেখাশোনা করে। সমু সারা বছরের জন্য গ্রামপ্রধানের এখানে নিযুক্ত থাকে এবং এরজন্য মোট 1000 টাকা পায়। রামুর আরও তিনপুত্র ও দুই কন্যা রয়েছে কিন্তু তাদের এখনও কাজ করার মতো বয়স হয়নি। তার স্ত্রী সুনহারি যে গবাদি পশুর গোয়াল পরিষ্কারের কাজে ঠিকা (Part time) শ্রমিক হিসাবে কাজ করে। সে প্রতিদিন আধা লিটার দুধ ও সবজি সহ কিছু রান্না করা খাবার পায়। সাথে সাথে মরশুমের ব্যস্ত সময়ে সে তার স্বামীর সাথে মাঠে কাজ করে এবং তার স্বামীর রোজগার বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে। কৃষিকাজ ঋতু নির্ভর হওয়ার কারণে রামু শুধুমাত্র বছরের স্বল্প সময়ে নিয়োজিত থাকে যখন বীজবপন, রোপণ ও ফসল তোলা হয়। চারা রোপণ থেকে ফসল পাকা পর্যন্ত বছরের প্রায় চারমাস সে বেকার থাকে। সে তখন কৃষি বর্হিভূত ক্ষেত্রে কাজের সন্ধান করে। অনেক সময় সে গ্রামে ইট তৈরি বা নির্মাণক্ষেত্রে কাজ পায়। তার সমস্ত চেষ্টায় রামু নগদে বা বস্তুগতভাবে যথেষ্ট আয় করে যাতে করে সে তার পরিবারের জন্য দুবেলা আহারের সংস্থান করতে পারে। যদিও, যে দিনগুলিতে সে কোনো কাজ পায় না, সে এবং তার পরিবার সত্যিই অসুবিধার সম্মুখীন হয় এবং অনেকক্ষেত্রে তার ছোটো বাচ্চাদের না খেয়ে ঘুমোতে হয়। দুধ বা সবজি পরিবারের আহারে নিয়মিত নয়। কৃষিকাজ যেহেতু ঋতুনির্ভর তাই বছরের যে চারমাস সে বেকার থাকে তখন তার কোনো খাদ্য নিরাপত্তা থাকে না।

চলো আলোচনা করি

- কৃষি কেন মরশুমি কার্যকলাপ?
- রামু কেন বছরের প্রায় চার মাস বেকার থাকে?
- রামু যখন বেকার অবস্থায় থাকে তখন সে কী করে?
- রামুর পরিবারের অন্যান্য পরিপূরক আয়ের উৎস কারা?
- রামু যখন কাজ পায় না তখন সে কেন অসুবিধার সম্মুখীন হয়?
- কখন রামু খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় থাকে?

আহমেদের গল্প

আহমেদ বেঙ্গালুরুর একজন রিক্‌শাচালক। সে তার তিন ভাই, দুই বোন ও বৃদ্ধ মাতাপিতাকে নিয়ে ঝুমড়ি তলা থেকে চলে এসেছে। সে 'ঝুগ্গি' অঞ্চলে থাকে। তার সারাদিনে রিক্‌শা টেনে যে আয় হয় তার উপর নির্ভর করেই গোটা পরিবার বেঁচে রয়েছে। যদিও, তার কোনো সুরক্ষিত চাকরি নেই এবং তার দৈনিক আয় অনিয়মিত। কিছুদিন সে যথেষ্ট উপার্জন করতে পারে এবং তখন তার প্রাত্যহিক প্রয়োজনী দ্রব্যসামগ্রী কেনার পরও কিছু সঞ্চয় করতে পারে। অন্যান্য দিন তার এত কম আয় হয় যা দিয়ে সে নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য ক্রয় করতে অসমর্থ হয়। যদিও সৌভাগ্যক্রমে আহমেদের একটি হলুদ কার্ড (Yellow Card) রয়েছে, যা হল দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারীদের জন্য বণ্টন ব্যবস্থার (PDS) কার্ড। ওই কার্ডের সাহায্যে আহমেদ তার নিত্য প্রয়োজনীয় গম, ভাত, চিনি ও কেরোসিন তেল পর্যাপ্ত পরিমাণ পায়। সে ওই প্রয়োজনীয় পণ্যগুলি বাজারের চেয়ে অর্ধেক মূল্যে পায়। সে তার মাসিক পণ্যাদি একটি নির্দিষ্ট দিনে কিনে থাকে, যেদিন দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারীদের জন্য রেশনের দোকান খোলা থাকে। এইভাবে আহমেদ প্রয়োজনের চেয়ে কম আয় করেও তার বড়ো পরিবার নিয়ে বেঁচে থাকতে সমর্থ হচ্ছে, যেখানে সে পরিবারে একমাত্র উপার্জনকারী।

চলো আলোচনা করি

- রিকশা চালিয়ে কি আহমদের নিয়মিত রোজগার হয়ে থাকে?
- যদিও রিকশা চালিয়ে আহমদের আয় কম তবুও হলুদ কার্ড তাকে কীভাবে পরিবার পরিচালনায় সাহায্য করছে?

সামাজিক ব্যবস্থাপনা এবং সাথে খাবার কিনতে পারার অক্ষমতাও খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার অন্যতম ভূমিকা রয়েছে। সমাজের তপশিলিজাতি (SCs), তপশিলি উপজাতি (STs) এবং অন্যান্য পশ্চাৎপদ বর্গের (OBCs) মধ্যে যারা স্বল্প জমির অধিকারী বা স্বল্প উৎপাদনে যুক্ত তারাও খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভোগেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে যারা কাজের সন্ধানে এক অঞ্চল থেকে অন্য অঞ্চলে উদ্‌বাস্তু হয়ে এসেছে, তারাও সর্বাধিক খাদ্য নিরাপত্তাহীন জনগণের মধ্যে রয়েছে। এক্ষেত্রে মহিলাদের মধ্যে অপুষ্টির মারাত্মক প্রকোপ লক্ষ করা যায়। গর্ভবতী ও শিশু প্রতিপালনকারী মায়েদের একটি বিরাট অংশ এবং পাঁচ বছরের নীচের শিশুরা খাদ্য নিরাপত্তাহীন জনগণের এক বিরাট অংশ।

1998-99 সালের National Health & Family Survey (NHFS) অনুসারে, এরূপ মহিলা এবং শিশুর সংখ্যা প্রায় 11 কোটি।

বেশিমাত্রায় দরিদ্র বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রবণতা বা অধিক পরিমাণে আদিবাসী অধ্যুষিত যেসব এলাকা ভারতে রয়েছে এমনসব অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া রাজ্যে খাদ্য নিরাপত্তাহীন মানুষের সংখ্যা অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় অনেক বেশি। বাস্তবে উত্তরপ্রদেশ (পূর্বে ও দক্ষিণ পূর্বে), বিহার, ঝাড়খণ্ড, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, ছত্রিশগড়, মধ্যপ্রদেশের একাংশ এবং মহারাষ্ট্রে দেশের বেশিরভাগ খাদ্য নিরাপত্তাহীন জনগণেরা বাস করে।

ক্ষুধা হল খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার অপর একটি সূচক। ক্ষুধা শুধুমাত্র দারিদ্র্যের প্রকাশ নয়, তা দারিদ্র্যের কারণও বটে। তাই খাদ্য নিরাপত্তার মাধ্যমে বর্তমান ক্ষুধাকে দূর করা যায় এবং ভবিষ্যতে ক্ষুধার সম্ভাবনাকে কমানো যায়। ক্ষুধা দীর্ঘকালীন এবং মরশুমি হয়ে থাকে। দীর্ঘদিন ধরে পরিমাণে অথবা গুণগতভাবে অপর্যাপ্ত পরিমাণে খাবার পাওয়ার ফলে দীর্ঘকালীন ক্ষুধার সৃষ্টি হয়। দরিদ্র মানুষ দীর্ঘকালীন ক্ষুধায় কষ্ট পায় কারণ তাদের আয়

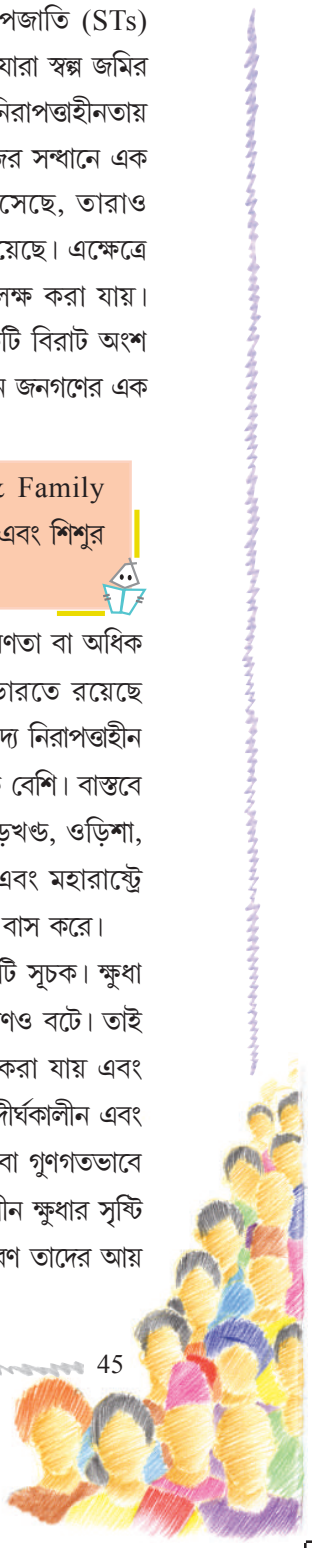

কম থাকায় বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্যসামগ্রী কিনতে অসমর্থ হয়। মরশুমি ক্ষুধা সাধারণত ফসল বোনা ও ফসল কাটার যে চক্র রয়েছে তার থেকে উদ্ভূত হয়। গ্রামাঞ্চলে এই ধরনের ক্ষুধার প্রাবল্য দেখা যায়, কারণ কৃষিক্ষেত্রের একটি মরশুমি চরিত্র রয়েছে এবং শহরাঞ্চলে অনিয়মিত শ্রমিক রয়েছে যেমন বর্ষাকালে অনিয়মিত নির্মাণ শ্রমিকদের কাজ কম থাকে। ফলে একজন লোক ওই ক্ষুধায় আক্রান্ত হয় যখন সে সারাবছর ধরে কাজ পায় না।

সারণি 4.2 : ভারতের ক্ষুধা আক্রান্ত পরিবারের শতকরা হিসাব

বছর	ক্ষুধার প্রকার		
	মরশুমি	সর্বদা	মোট
গ্রামীণ			
1983	16.2	2.3	18.5
1993–94	4.2	0.9	5.1
1999–2000	2.6	0.7	3.3
শহুরে			
1983	5.6	0.8	6.4
1993–94	1.1	0.5	1.6
1999–2000	0.6	0.3	0.9

উৎস : সাগর (Sagar) 2004

উপরে সারণিতে দেখা যায় ভারতে সর্বদা এবং সাথে সাথে মরশুমি ক্ষুধা আক্রান্তের হার শতকরা হিসাবে হ্রাস পেয়েছে।

স্বাধীনতার সময়কাল থেকেই ভারত খাদ্যে স্বয়ম্ভর হওয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে ভারতের নীতি নির্ধারকরা খাদ্যে স্বয়ম্ভরতার জন্য সমস্ত প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। ভারত কৃষিতে এক নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিল যার ফলে কৃষিতে, বিশেষত গম ও ধানে "সবুজ বিপ্লব" ঘটে।

1968 সালের জুলাই মাসে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধি সবুজ বিপ্লবের প্রশংসনীয় সাফল্যকে স্মরণ করে 'গম বিপ্লব' নামে বিশেষ ডাকটিকিট প্রকাশ করে সবুজ বিপ্লবকে

চিত্র 4.3 *সবুজ বিপ্লবের ফলে ফলিত পাঞ্জাবের একটি উচ্চফলনশীল গম খেতে দণ্ডায়মান একজন কৃষক।*

সরকারিভাবে নথিভুক্ত করেন। গমের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত সাফল্য পরবর্তী সময়ে ধানের ক্ষেত্রেও বজায় থাকে। যদিও খাদ্যশস্যের উৎপাদনের এই বৃদ্ধি অসামঞ্জস্য উৎপাদনের সর্বোচ্চ হার পাওয়া যায় পাঞ্জাব ও হরিয়ানায়। যেখানে খাদ্যশস্যের উৎপাদন 1964-65 সালে যা ছিল 7.23 মিলিয়ন টন তা 2013-14 সালে সর্বকালীন উৎপাদন 265 মিলিয়ন টনে পৌঁছায়।

উত্তরপ্রদেশ ও পাঞ্জাবে গমের রেকর্ড পরিমাণ উৎপাদন হয়েছিল 2014-15 সালে যথাক্রমে 25.22 এবং 15.78 মিলিয়ন টন।

অপরপক্ষে, পশ্চিমবঙ্গ ও উত্তরপ্রদেশে রেকর্ড পরিমাণ উৎপাদন হয়েছিল যথাক্রমে 14.71 এবং 12.22 মিলিয়ন টন।

প্রস্তাবিত কার্যক্রম :-

পার্শ্ববর্তী গ্রামের কয়েকটি কৃষিক্ষেত্র পরিদর্শন করো এবং কৃষকরা যে খাদ্যশস্য উৎপাদন করে তার বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করো।

ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা

আবহাওয়ার প্রতিকূলতা থাকা সত্ত্বেও 70-এর দশকের পরবর্তী সময়ে সবুজ বিপ্লবের জন্য দেশে দুর্ভিক্ষের পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি।

বিগত ত্রিশ বছরের উপর ভারত খাদ্যে স্বয়ম্ভর হয়ে উঠেছে। কারণ সারা দেশজুড়ে বিভিন্ন প্রজাতির শস্য উৎপাদন হয়। সুচিন্তিত খাদ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা অনুসরণ করে ভারত সরকার সারা দেশ জুড়ে খাদ্যশস্যের প্রাপ্তিকে (এমনকি প্রতিকূল আবহাওয়া বা অন্য কারণে) সুনিশ্চিত করে তুলেছে।

লেখচিত্র 4.1 : ভারতে খাদ্যশস্যের উৎপাদন (মিলিয়ন টনে)

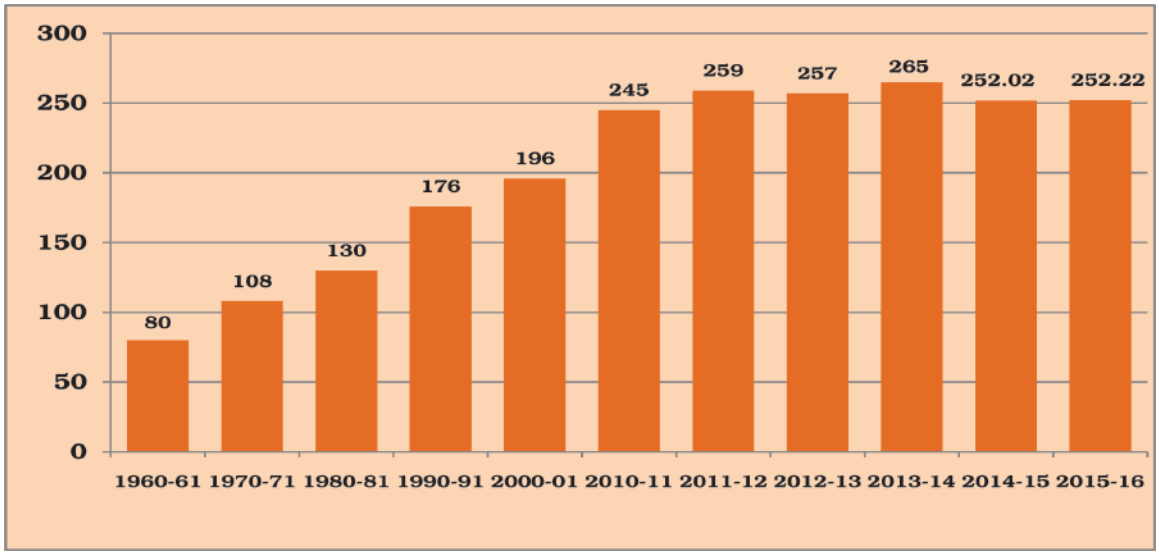

উৎস : Pocket Book of Agricultural Statistics, 2016, Government of India.

চলো আলোচনা করি

4.1 নং লেখচিত্রটি অধ্যয়ন করো এবং নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দাও :

(a) কোন সালে ভারত খাদ্যশস্য উৎপাদনের ক্ষেত্রে 200 মিলিয়ন টন প্রতিবছর সীমারেখা অতিক্রম করে?

(b) খাদ্যশস্য উৎপাদনে কোন্ দশকে ভারত সর্বোচ্চ (decadal) উৎপাদনের সাক্ষী হয়?

(c) 2000-01 সাল থেকে কি ভারতে নিরবচ্ছিন্নভাবে উৎপাদন বৃদ্ধি পাচ্ছে?

আপদকালীন মজুত (Buffer Stock) ভাণ্ডার কী?

আপদকালীন মজুত ভাণ্ডার হচ্ছে ভারতীয় খাদ্য নিগম (FCI) দ্বারা সরকার কর্তৃক কৃষকদের কাছ থেকে সংগৃহীত খাদ্যশস্য, যা মূলত চাল ও গম। যেসব রাজ্যে উদ্বৃত্ত উৎপাদন হয় সেইসব রাজ্যের কৃষকদের কাছ থেকে ভারতীয় খাদ্য নিগম (FCI) চাল ও গম কিনে থাকে। কৃষকরা তাদের ফসলের জন্য পূর্বঘোষিত একটি মূল্য পায়। এই মূল্যটিকে বলে ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (Minimum Support Price)। কৃষকদের উৎপাদনে আকৃষ্ট করার জন্য শস্য বপনের পূর্বেই সরকার এই ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (MSP) ঘোষণা করে। ক্রয় করা খাদ্যশস্য শস্যাগারে মজুত করা হয়। তুমি কি জান কেন সরকার এই আপদকালীন মজুত ভাণ্ডার গড়ে তোলে? যেসব অঞ্চলে ঘাটতি উৎপাদন হয়েছে এবং সমাজের দরিদ্রতম স্তরের জনগণের মধ্যে বাজার মূল্য থেকে কম দামে বণ্টন করা হয় যাকে বলা হয় 'বণ্টন মূল্য' (Issue Price)। এটি প্রতিকূল আবহাওয়া বা প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য সৃষ্ট শস্য সংকটের সমস্যা সমাধানেও সাহায্য করে।

গণবণ্টন ব্যবস্থা (PDS) কী?

ভারতীয় খাদ্য নিগম (FCI) কর্তৃক সংগৃহীত খাদ্যশষ্য সরকার নিয়ন্ত্রিত রেশন (Ration) দোকানের মাধ্যমে সমাজের দরিদ্র লোকদের মধ্যে বণ্টন করা হয়। তাকে বলে গণবণ্টন ব্যবস্থা (PDS)। এখন প্রায় সব এলাকাতেই যেমন গ্রাম, নগর বা শহরে রেশনের দোকান রয়েছে। সারা দেশে প্রায় 5.5 লক্ষ রেশন দোকান রয়েছে। রেশন দোকানগুলিকে ন্যায্যমূল্যের দোকানও (Fair Price Shop) বলা হয় যেখানে খাদ্যশস্য, চিনি, রান্নার কেরোসিন তেল মজুত করা হয়। এই পণ্যগুলি জনগণের মধ্যে বাজার মূল্য হতে কম দামে বিক্রি করা হয়। যেসব পরিবারের রেশনকার্ড রয়েছে তারা প্রতিমাসে এইসব পণ্য নির্ধারিত পরিমাণে (যেমন 35 কেজি খাদ্যশস্য, 5 লিটার কেরোসিন, 5

কেজি চিনি ইত্যাদি) নিকটবর্তী রেশন দোকান থেকে নির্ধারিত দামে কিনতে পারে।

*তিন প্রকারের রেশনকার্ড রয়েছে — (a) হতদরিদ্রদের জন্য অন্ত্যোদয় কার্ড (b) দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারীদের জন্য বিপিএল (BPL) কার্ড (C) অন্যান্যদের জন্য এপিএল (APL) কার্ড।

প্রস্তাবিত কার্যক্রম :-

তোমার এলাকার রেশন দোকান পরিদর্শন করে নিম্নলিখিত তথ্যগুলি সংগ্রহ করো :-

1. কখন রেশন দোকান খোলা হয়?
2. রেশন দোকানে কী কী পণ্য বিক্রি করা হয়?
3. রেশন দোকানের চাল ও চিনির মূল্যের সাথে যে-কোনো মুদি দোকানের দামের তুলনা করো। (দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী পরিবারের জন্য)
4. নির্ণয় করো :-

— তোমার কি কোনো রেশনকার্ড আছে?

— সম্প্রতি তোমার পরিবার রেশন দোকান থেকে কী পণ্য ক্রয় করেছে?

— তারা কি কোনো অসুবিধায় পড়েছে?

— রেশন দোকানের প্রয়োজন কেন?

চিত্র *4.4*

1940-এর দশক বাংলায় দুর্ভিক্ষের কারণে ভারতে রেশনিং ব্যবস্থা চালু হয়। 1960-এর দশকে সবুজ বিপ্লবের পূর্বে চরম খাদ্য সংকটের কারণ রেশনিং ব্যবস্থা পুনরায় চালু হয়। জাতীয় নমুনা সমীক্ষা (NSSO) সংস্থার 1970-এর দশকের মাঝামাঝি সময়ের প্রতিবেদনে উচ্চহারে দরিদ্রের প্রমাণ পাওয়ায় তিনটি খাদ্য প্রদান কার্যক্রম ঘোষিত হয় — খাদ্যশস্যের গণবণ্টন ব্যবস্থা (যা পূর্বেই চালু ছিল কিন্তু তাকে শক্তিশালী করা হয়), নিবিড় শিশু উন্নয়ন প্রকল্প (ICDS- যা পরীক্ষামূলকভাবে 1975 সালে চালু হয়) এবং কাজের বদলে খাদ্য প্রকল্প ** (FFW) (যা 1977-78 সালে চালু হয়) সময়ের সাথে সাথে প্রকল্প পরিচালনায় অর্জিত জ্ঞানের ভিত্তিতে নতুন নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় বা পুরোনো কর্মসূচিকে পূর্ণগঠন করা হয়। বর্তমানে, প্রধানত গ্রামীণ অঞ্চলে বেশ কিছু দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি (PAPs) চালু আছে যাদের অনেকগুলিকে খাদ্যশস্য প্রদানের অংশ হিসাবে গণ্য করা হয়। যেখানে কিছু কিছু কর্মসূচি যেমন গণবণ্টন ব্যবস্থা (PDS), সরকারি দ্বিপ্রাহরিক আহার প্রকল্প (MDM) বিশেষত খাদ্য সুনিশ্চিতকরণ কর্মসূচির অন্তর্গত তেমনি অধিকাংশ দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি সমুহও খাদ্য নিরাপত্তাকে ত্বরান্বিত করে। কর্মনিয়োগ কর্মসূচিগুলি দরিদ্র লোকদের আয়ের স্তর বৃদ্ধি ঘটিয়ে খাদ্য নিরাপত্তাকে বাড়িয়ে তুলতে সহায়তা করে।

প্রস্তাবিত কার্যক্রম :-

সরকার প্রবর্তিত কিছু প্রকল্পের বিশদে সংগ্রহ করো — কোন্‌গুলি খাদ্যশস্য প্রদানের অংশ।

সংকেত : গ্রামীণ মজুরি ভিত্তিক কর্মনিয়োগ প্রকল্প (RWEP), সুনিশ্চিত কর্মনিয়োগ প্রকল্প, সম্পূর্ণ গ্রামীণ রোজগার প্রকল্প, দ্বিপ্রাহরিক আহার প্রকল্প, নিবিড় শিশু উন্নয়ন সেবা প্রকল্প ইত্যাদি।

তোমার শিক্ষকের সাথে এব্যাপারে আলোচনা করো।

**** রাষ্ট্রীয় খাদ্য সুরক্ষা আইন, 2013**

এই আইনের মাধ্যমে সাশ্রয়ী মূল্যে খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তা প্রদান করা হয় এবং জনগণকে মর্যাদা সহ জীবনধারণে সহায়তা করে। এই আইনে, গ্রামীণ জনগণের 75% এবং শহরাঞ্চলের 50% জনগণ খাদ্য সুরক্ষার আওতায় উপযুক্ত হিসাবে শ্রেণিভুক্ত করা হয়েছে।

গণবণ্টন ব্যবস্থার (PDS) সাম্প্রতিক অবস্থা

গণবণ্টন ব্যবস্থা হল খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারের একটি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। শুরুর দিকে এই ব্যবস্থা ছিল সর্বজনীন যেখানে ধনী দরিদ্রের মধ্যে ভেদাভেদ হত না। ক্রমশ, এই ব্যবস্থাকে সংশোধন করে অধিক দক্ষ ও উদ্দেশ্যসম্পন্ন করে তোলা হয়। 1992 সালে 1770 টি সমষ্টি উন্নয়ন কেন্দ্রে (Block) পুনর্গঠিত গণবণ্টন ব্যবস্থা (PDS) চালু হয়। এর লক্ষ্য ছিল দুর্গম ও পিছিয়ে-পড়া এলাকায় গণবণ্টন ব্যবস্থার (PDS) সুযোগ পৌঁছে দেওয়া। 1997 সালের জুন মাস থেকে, একটি পুনর্গঠিত প্রচেষ্টায়, সমস্ত এলাকার দরিদ্রদের গণবণ্টন ব্যবস্থার আওতায় আনার জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্যাভিমুখী গণবণ্টন ব্যবস্থা (TPDS) চালু করা হয়। সেই সময়ই প্রথম দরিদ্র ও যারা দরিদ্র নয় তাদের জন্য পৃথক দাম নির্ধারণ নীতি গ্রহণ করা হয়। পরবর্তী সময়ে 2000 সালে দুটি বিশেষ প্রকল্প গ্রহণ করা হয় — যেমন অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা*** (AAY) যা চালু হয় হতদরিদ্র জনগণের জন্য এবং দরিদ্র বয়স্ক নাগরিকদের জন্য অন্নপূর্ণা কর্মসূচি (APS)। এই দুই প্রকল্পের কাজকে বর্তমানে গণবণ্টন ব্যবস্থার (PDS) সাথে যুক্ত করা হয়েছে।

সারণি 4.3 : PDS এর কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য

প্রকল্পের নাম	প্রয়োগ বছর	লক্ষ্য ভিন্ন শ্রেণি	সর্বশেষ পরিমাণ	বিক্রয় মূল্য (Rs per kg.)
PDS	1992 পর্যন্ত	সর্বজনীন	–	W-2.34 R-2.89
RPDS	1992	পশ্চাৎপদ ব্লক	20 কিলো খাদ্যশস্য	W-2.80 R-3.77
TPDS	1997	দরিদ্র ও দরিদ্র নয় BPL APL	35 কিলো খাদ্যশস্য	BPL – W-4.15 R-5.65 APL-W-6.10 R-8.30
AAY	2002	দরিদ্রের মধ্যে দরিদ্রতম	35 কিলো খাদ্যশস্য	W-2.00 R-3.00
APS	2000	বরিষ্ঠ নাগরিক	10 কিলো খাদ্যশস্য	বিনামূল্যে
জাতীয় খাদ্য নিরাপত্তা আইন (NFSA)	2013	অগ্রাধিকার প্রাপ্ত পরিবারবর্গ	জন প্রতি প্রতি মাসে 5 কিলো	W-2.00 R-3.00 মোটা-1.00 দানাশস্য

Note: W - গম; R - চাল; BPL - Below poverty line; APL - Above poverty line

উৎস : Economic Survey

গণবণ্টন ব্যবস্থার (PDS) কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য নীচের 4.3 সারণিতে সারাংশ আকারে তুলে ধরা হয়েছে —

খাদ্যশস্যের দামে স্থিতিশীলতা আনার ক্ষেত্রে এবং ভোক্তার কাছে স্বল্প মূল্যে খাদ্যশস্য নিশ্চিত করতে সরকারি যেসব নীতি রয়েছে তা রূপায়ণে গণবণ্টন ব্যবস্থা (PDS) সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। এই ব্যবস্থা খাদ্যশস্যকে উদ্‌বৃত্ত অঞ্চল থেকে ঘাটতিযুক্ত অঞ্চলে বণ্টন করার মধ্য দিয়ে ব্যাপক ক্ষুধা ও দুর্ভিক্ষকে এড়িয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে কার্যকরী ভূমিকা নিয়েছে। তার সাথে সাথে, সাধারণভাবে দরিদ্র মানুষের দিকে লক্ষ রেখে মূল্য সংশোধন করা হচ্ছে। ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (MSP) ও খাদ্যশস্য সংগ্রহের ব্যবস্থা সমেত সামগ্রিক সরকারি গণবণ্টন ব্যবস্থা কম দামে খাদ্যশস্য সরবরাহের ব্যবস্থা করছে এবং কয়েকটি অঞ্চলের কৃষকদের আয়ের নিরাপত্তা প্রদান করছে।

যদিও গণবণ্টন ব্যবস্থাকে বিভিন্ন দিকে চরম সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে। গুদামে উদ্‌বৃত্ত খাদ্যশস্য থাকা সত্ত্বেও লক্ষণীয়ভাবে খাদ্যাভাব বিভিন্ন অঞ্চলে বজায় রয়েছে। ভারতীয় খাদ্য নিগম (FCI) এর গুদামগুলিতে খাদ্যশস্য উপচে পড়ছে যার কিছু অংশ পচে যাচ্ছে এবং ইঁদুর খেয়ে নিচ্ছে। 4.2 লেখচিত্রে কেন্দ্রীয় খাদ্যশস্য মজুত হার ও আপদকালীন মজুত হারের পার্থক্য দেখানো হয়েছে।

***** অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা (AAY)**

অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা 2000 সালের ডিসেম্বর মাসে শুরু হয়। এই প্রকল্পে দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা বিপিএল পরিবারের মধ্যে 1 কোটি হতদরিদ্র পরিবারকে চিহ্নিত করা হয়। বিভিন্ন রাজ্যের গ্রামোন্নয়ন দফতরের মাধ্যমে BPL সমীক্ষার দ্বারা এই হতদরিদ্র পরিবারগুলিকে চিহ্নিত করা হয়। প্রতিটি চিহ্নিত পরিবারকে এই প্রকল্পে উচ্চ ভর্তুকি মূল্যে 2 টাকা কিলো দরে গম ও 3 টাকা কিলো দরে চাল এই হিসাবে 25 কিলো খাদ্যশস্য দেওয়া হয়। 2002-এর এপ্রিল থেকে এই পরিমাণ 25 কিলো থেকে বৃদ্ধি করে 35 কিলো করা হয়েছে। জুন, 2003 এবং আগস্ট, 2004 সালে যথাক্রমে 50 লাখ করে নতুন পরিবারকে এই প্রকল্পে যুক্ত করা হয়েছে। এই বৃদ্ধির ফলে 2 কোটি পরিবারকে অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনার (AAY) আওতায় আনা হয়েছে।

লেখচিত্র 4.2: Central Foodgrains (Wheat + Rice) Stock and Minimum Buffer Norm (Million Tonnes)

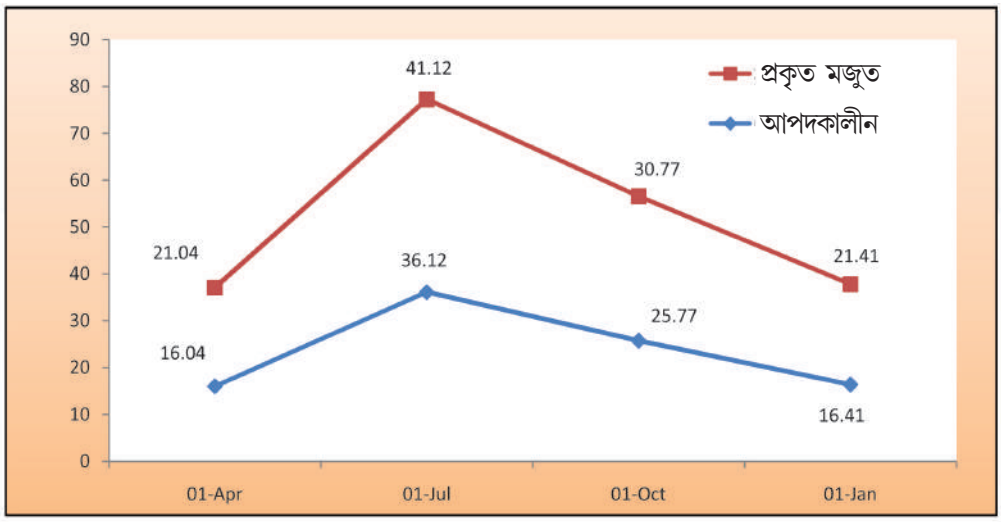

উৎস : Food Corporation and India

ভর্তুকি হচ্ছে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত কোনো পণ্যের বাজার মূল্যের সাথে সম্পূরক মূল্য যা উৎপাদককে দেওয়া হয়। ভর্তুকি ক্রেতার জন্য ক্রয়মূল্য কমিয়ে আনে এবং দেশীয় উৎপাদকের আয় বৃদ্ধি করে থাকে।

চলো আলোচনা করি

4.2 নং লেখচিত্র অধ্যয়ন করো এবং নীচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও :-

- সাম্প্রতিক কোন্ বছর সরকারের খাদ্যশস্যের মজুত সর্বোচ্চ ছিল।
- ভারতীয় খাদ্য নিগমের (FCI) ন্যূনতম আপদকালীন মজুতের পরিমাণ কত?
- কেন ভারতীয় খাদ্য নিগমের (FCI) মজুত ভাণ্ডারে খাদ্যশস্য উপচে পড়ছে?

2014 সালে, ভারতীয় খাদ্য নিগমের (FCI) গুদামে 65.3 মিলিয়ন টন গম ও ধান মজুত ছিল, যা ন্যূনতম প্রয়োজনীয় মজুতের চেয়ে অনেক বেশি। প্রয়োজনীয় আপদকালীন মজুতের চেয়ে বরাবরই তা ধারাবাহিকভাবে বেশি ছিল। সরকার বিভিন্ন প্রকল্পের মাধ্যমে খাদ্যশস্য বণ্টন করায় অবস্থা কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে। এই ব্যাপারে সকলেই মোটামুটি একমত যে খাদ্যশস্যের অতিরিক্ত মজুত অপ্রয়োজনীয় এবং এর ফলে খাদ্যশস্যের অপচয় হয়। বিপুল পরিমাণে খাদ্যশস্য মজুতের ফলে পরিবহণ ব্যয় বৃদ্ধি পায় এবং খাদ্যশস্যের অপচয় ও গুণগতমান হ্রাস পায়। কয়েক বছরের জন্য ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (MSP) স্থির করে রাখার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণভাবে বিবেচনা করা উচিত।

পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও অন্ধ্রপ্রদেশের মতো উদ্‌বৃত্ত খাদ্যশস্য উৎপাদনকারী রাজ্যগুলির চাপের ফলে বর্ধিত ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে বেশি পরিমাণে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা রয়েছে। উপরন্তু খাদ্যশস্য সংগ্রহ মূলত অল্প কিছু উন্নত অঞ্চলে (পাঞ্জাব, হরিয়ানা,

চিত্র 4.5 *কৃষকেরা শস্যভর্তি বস্তাগুলি শস্যগুদামে নিয়ে যাচ্ছে।*

উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশ, অন্ধপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গের কিছু অংশ) মূলত দুটি খাদ্যশস্য চাল ও গমে সীমাবদ্ধ, তাই ন্যূনতম সহায়ক মূল্যে বৃদ্ধি কৃষকদের, বিশেষত উদ্‌বৃত্ত রাজ্যগুলির কৃষকদের জমিকে দরিদ্রের জন্য সস্তা এবং মোটা দানার নিকৃষ্ট খাদ্যশস্য উৎপাদন থেকে সরিয়ে ধান ও গম উৎপাদনের দিকে নিয়ে আসতে উদ্‌বুদ্ধ করে। ধান উৎপাদনে জলের ব্যাপক ব্যবহার পরিবেশের ক্ষতি করে এবং ভূমির জলস্তরকে নীচে নামিয়ে দেয়, ফলে ওইসব রাজ্যগুলিতে ভবিষ্যতে কৃষি উৎপাদনে ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে।

জাতীয় নমুনা সমীক্ষা সংস্থার (NSSO) প্রতিবেদন অনুসারে,

*ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (MSP) বৃদ্ধির ফলে সরকারের খাদ্যশস্য রক্ষণাবেক্ষণ খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে। সরকারের এই খরচ বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভারতীয় খাদ্য নিগমের (FCI) পরিবহণ ব্যয় ও গুদামজাতকরণের খরচ বৃদ্ধিও অন্যতম কারণ।

গ্রামাঞ্চলে মাথাপিছু প্রতিমাসে চালের ব্যবহার 2004-05 সালে 6.38 কিলো থেকে কমে 2011-12 সালে 5.98 কিলো হয়েছে। শহরাঞ্চলে চালের ব্যবহার 2004-05 সালে 4.71 কিলো থেকে 2011-12 সালে কমে 4.19 কেজি হয়েছে। মাথাপিছু গণবণ্টন ব্যবস্থায় চালের ব্যবহার গ্রামাঞ্চলে 2004-05 সালের তুলনায় দ্বিগুণ হয়েছে এবং শহরাঞ্চলে তার 66% বৃদ্ধি পেয়েছে। মাথাপিছু গণবণ্টন (PDS) ব্যবস্থায় গমের ব্যবহার শহরাঞ্চল ও গ্রামাঞ্চল উভয় ক্ষেত্রেই দ্বিগুণ হয়েছে।

গণবণ্টন ব্যবস্থার বিক্রেতারা অনেক সময়ই বিভিন্ন অন্যায় আচরণ করে থাকে যেমন উপভোক্তাদের খাদ্যশস্য না দিয়ে তা খোলা বাজারে চড়া দামে বিক্রি করা, খারাপ মানের খাদ্যশস্য রেশন দোকানে বিক্রি করা, অনিয়মিত দোকান খোলা ইত্যাদি। অনেক সময় দেখা যায় যে, রেশন দোকানে খারাপ মানের খাদ্যশস্য অবিক্রিত অবস্থায় পরে রয়েছে। তা একটি বড়ো সমস্যা। রেশন দোকানে বিক্রি না হলে ভারতীয় খাদ্য নিগমের গুদামে বৃহদায়তনের মজুত জমতে থাকে। সাম্প্রতিক সময়ে গণবণ্টন ব্যবস্থার দুর্বল হওয়ার অন্য একটি কারণ পাওয়া গেছে। পূর্বে গরিব হোক বা না হোক সব পরিবারের জন্য জনসংখ্যা অনুসারে রেশন কার্ডে নির্দিষ্ট পরিমাণ সামগ্রী যেমন চাল, গম, চিনি ইত্যাদি মজুত থাকত। এইসব পণ্য সব পরিবারের কাছে সমমূল্যে বিক্রয় করা হত। বর্তমান ব্যবস্থার মতো তিন ধরনের কার্ড ও বিভিন্ন প্রকারের দাম তখন ছিল না। কোনো একটি রেশন দোকান হতে বহুসংখ্যক পরিবার একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ খাদ্যশস্য কিনতে পারে। এর মধ্যে নিম্ন আয়ের পরিবারও ছিল যাদের আয় দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা পরিবারে আয়ের থেকে অনেকটা বেশি। বর্তমানে তিন ধরনের মূল্যস্তর নির্ধারিত গণবণ্টন ব্যবস্থা (TPDS)-এর হাতে রয়েছে, দারিদ্র্যসীমার উপরে যে-কোনো পরিবার রেশন দোকানে দামের ক্ষেত্রে অল্প ছাড় পেয়ে থাকে। দারিদ্র্যসীমার উপরের (APL) পরিবারের ক্ষেত্রে দাম প্রায় বাজার দামের সমান হয়। তাই রেশন দোকান থেকে ওই সব পণ্য কেনার ক্ষেত্রে তাদের কম উৎসাহ পরিলক্ষিত হয়।

খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সমবায়গুলির ভূমিকা

খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিশেষত দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে সমবায়েরও একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। গরিব মানুষকে কম মূল্যে পণ্য বিক্রি করতে সমবায় সমিতিগুলি দোকান খোলে। উদাহরণস্বরূপ, তামিলনাড়ুতে ন্যায্য মূল্যের দোকানের 94% পরিচালিত হয় সমবায় সমিতি দ্বারা। দিল্লিতে ভোক্তাদের কাছে নিয়ন্ত্রিত মূল্যে দুধ ও শাকসবজি পৌঁছে দেওয়ার জন্য মাদার ডেয়ারি প্রচেষ্টা গ্রহণ করেছে। গুজরাটে সমবায়ের এমন একটি সফলতার দৃষ্টান্ত হল — "আমুল" যে দুগ্ধ ও দুগ্ধজাত পণ্য উৎপাদন করে। যা দেশে 'শ্বেত বিপ্লব' এনেছে। সারাদেশে এমন আরও অনেক দৃষ্টান্ত রয়েছে যেখানে সমবায়গুলি সমাজের বিভিন্ন অংশে খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করছে।

অনুরূপে মহারাষ্ট্রে, একাডেমি অব ডেভলাপমেন্ট সায়েন্স (ADS) বিভিন্ন অঞ্চলে শস্য ব্যাংক গঠন করার জন্য বেসরকারি সংগঠনের (NGOs) একটি সমন্বিত ব্যবস্থা তৈরি করেছে। ADS বেসরকারি সংস্থাগুলির (NGO) কর্মক্ষমতা বৃদ্ধির জন্য খাদ্য নিরাপত্তার উপর প্রশিক্ষণের আয়োজন করে থাকে। মহারাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে এখন শস্য ব্যাংক বিষয়টি ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে শুরু করেছে। শস্য ব্যাংকের ধারণাকে NGO দ্বারা পুনরাবৃত্তির মাধ্যমে খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সরকারি নীতিকে প্রভাবিত করতে ADS-এর প্রচেষ্টা সাফল্য আনতে শুরু করেছে। ADS শস্য ব্যাংক কর্মসূচি খাদ্য নিরাপত্তার ক্ষেত্রে সফল ও অভিনব প্রচেষ্টা হিসাবে গণ্য করা হচ্ছে।

সারাংশ

একটি দেশের খাদ্য সুরক্ষা নিশ্চিত হয় যদি তার সকল জনগণের জন্য পর্যাপ্ত পুষ্টিকর খাদ্যের যোগান থাকে, সব জনসাধারণের প্রয়োজনীয় খাদ্যশস্যের ক্রয়ক্ষমতা থাকে এবং খাদ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে কোনো বাধা থাকে না। দারিদ্র্যসীমার নীচে থাকা জনগণ খাদ্য নিরাপত্তাহীন হতে পারে যেখানে অনেক সময় কিছুটা উন্নত সীমায় থাকা জনগণও প্রাকৃতিক দুর্যোগ বা বিপর্যয়ের কারণে খাদ্য নিরাপত্তাহীনতার সম্মুখীন হতে পারে। যদিও ভারতবর্ষে একটা বিরাট অংশের জনগণ খাদ্য ও পুষ্টিগুণের নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে, এক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয় যারা গ্রামের ভূমিহীন বা স্বল্প ভূমিযুক্ত গৃহস্থালির দরিদ্র জনগণ এবং শহরাঞ্চলের স্বল্প মজুরির পেশা ও মরশুমি কার্যকলাপের সাথে যুক্ত অস্থায়ী শ্রমিকগণ। দেশের কিছু অংশে খাদ্য নিরাপত্তাহীন জনগণের আনুপাতিক হার বেশি, যেমন দারিদ্র্যের অধিক প্রকোপ যুক্ত অর্থনৈতিকভাবে পিছিয়ে পড়া রাজ্য, উপজাতি ও প্রত্যন্ত অঞ্চল, দুর্যোগ প্রবণ অঞ্চল ইত্যাদি। সমাজের সমস্ত অংশের জনগণের খাদ্য নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে ভারত সরকার যত্নসহকারে খাদ্য সুরক্ষা ব্যবস্থা পরিকল্পনা করেছে, যার মূলত দুটি বিষয় রয়েছে : (a) আপদকালীন মজুত ভাণ্ডার (b) গণবণ্টন ব্যবস্থা (PDS)। সরকারি গণবন্টন ব্যবস্থার (PDS) সাথে সাথে বিভিন্ন দারিদ্র্য দূরীকরণ কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে যা খাদ্য সুরক্ষার উপাদান হিসাবে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। এরূপ কিছু কর্মসূচি হল — নিবিড় শিশু উন্নয়ন প্রকল্প (ICDS), খাদ্যের জন্য কাজ প্রকল্প (FFW), দ্বিপ্রাহরিক আহার প্রকল্প (MDM), অন্ত্যোদয় অন্ন যোজনা (AAY) ইত্যাদি। খাদ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি ভূমিকার সাথে সাথে বিভিন্ন সমবায় সংস্থা এবং বেসরকারি সংস্থাগুলি (NGOs) এই লক্ষ্যে নিষ্ঠার সঙ্গে কাজ করে যাচ্ছে।

অনুশীলনী

1. ভারতবর্ষে কীভাবে খাদ্য সুরক্ষা সুনিশ্চিত করা হয়েছে?
2. কোন্ শ্রেণির লোকেরা বেশি খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে?
3. ভারতবর্ষের কোন্ রাজ্যগুলি বেশি খাদ্য নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছে?
4. তোমার কি মনে হয় সবুজ বিপ্লব ভারতকে খাদ্যশস্যে স্বয়ম্ভর করেছে? কীভাবে?
5. ভারতের এক শ্রেণির জনগণ এখনও খাদ্যহীনতায় রয়েছে। — ব্যাখ্যা করো।
6. যে-কোনো দুর্যোগ বা বিপর্যয়ের সময়ে খাদ্য যোগানের ক্ষেত্রে কী ঘটে?
7. মরশুমি ক্ষুধা ও সর্বস্থায়ী ক্ষুধার মধ্যে পার্থক্য লেখো।
8. দরিদ্র অংশের জনগণের খাদ্য সুরক্ষার জন্য সরকার কী পদক্ষেপ নিয়েছে? সরকারী যে-কোনো দুটি প্রকল্প ব্যাখ্যা করো।
9. সরকার কেন আপদকালীন (Buffer) মজুত ভাণ্ডার সৃষ্টি করে?
10. টীকা লেখো ঃ-
    (a) ন্যূনতম সহায়ক মূল্য (MSP)
    (b) আপদকালীন মজুত ভাণ্ডার

(c) বিক্রয় মূল্য (Issue Price)

(d) ন্যায্য মূল্যের দোকান (FPS)

11.রেশন দোকানগুলির কাজকর্ম পরিচালনার ক্ষেত্রে কী কী অসুবিধা রয়েছে?

12.খাদ্য ও খাদ্য সম্পর্কযুক্ত পণ্য প্রদানের ক্ষেত্রে সমবায়ের (Cooperative) ভূমিকা লেখো।

References

Dev, S. Mahendra, Kannan, K.P. and Ramchandran, Neera (Eds.). 2003. *Towards a Food Secure India: Issues and Policies.* Institute for Human Development, New Delhi.

Sagar, Vidya. 2004. '*Food Security in India*', Paper presented in ADRF-IFRI Final Meeting on Food Security in India, September 10–11, New Delhi.

Saxena, N.C. 2004. '*Synergising Government Efforts for Food Security*' in Swaminathan, M.S. and Medrano, Pedro (Eds.), Towards Hunger Free India, East-West Books, Chennai.

Saxena, N.C. 2004. '*Reorganising Policies and Delivery for Alleviating Hunger and Malnutrition*' Paper presented at National Food Security Summit, New Delhi.

Sen, A.K. 1983. *'Poverty and Famines: An Essay on Entitlement and Deprivation'*. Oxford University Press.

Sharma, Rekha and Meenakshi, J.V. 2004. '*Micronutrient Deficiencies in Rural Diets*'. *Towards Hunger Free India: From Vision to Action*. Proceedings of Consultation on 'Towards Hunger-free India: Count Down from 2007'. New Delhi.

FAO 1996. *World Food Summit 1995*. Food and Agricultural Organisation, Rome.

Government of India. Economic Survey. 2002–03, 2003–04, 2004–05. Ministry of Finance. New Delhi.

IIPS 2000. *National Health and Family Survey* – 2. International Institute of Population Sciences. Mumbai.

UN 1975. *Report of the World Food Conference 1975*. (Rome), United Nations, New York.

Food Corporation of India; (fci.gov.in/stocks.php?view=18)